বাংলায় ভ্রমণ

—ঃ দ্বিতীয় খণ্ড ঃ—

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের
প্রচার বিভাগ হইতে
প্রকাশিত।

—১৯৪০—

মূল্য প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

বিষয় পত্রাঙ্ক

পূর্ব্ব ভারত রেলপথের
মানচিত্র।

বাংলা নাগপুর রেলপথের মানচিত্র।

আসাম বাংলা রেলপথের
মানচিত্র।
তেজপুর
আমিনগাঁও
লামডিং জং
শিলং
বদরপুর জং
শিলচর
কাটাখাল জং
দুর্লভছড়া
শ্রীমঙ্গল
সাতগাঁও
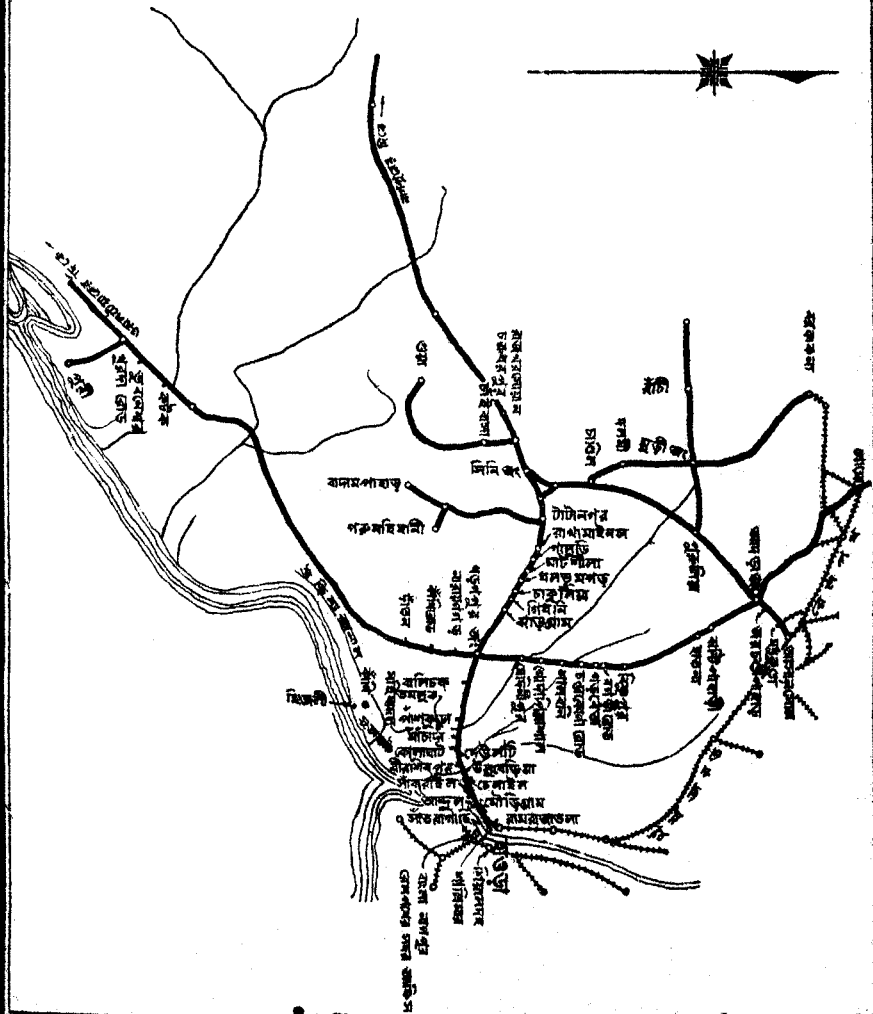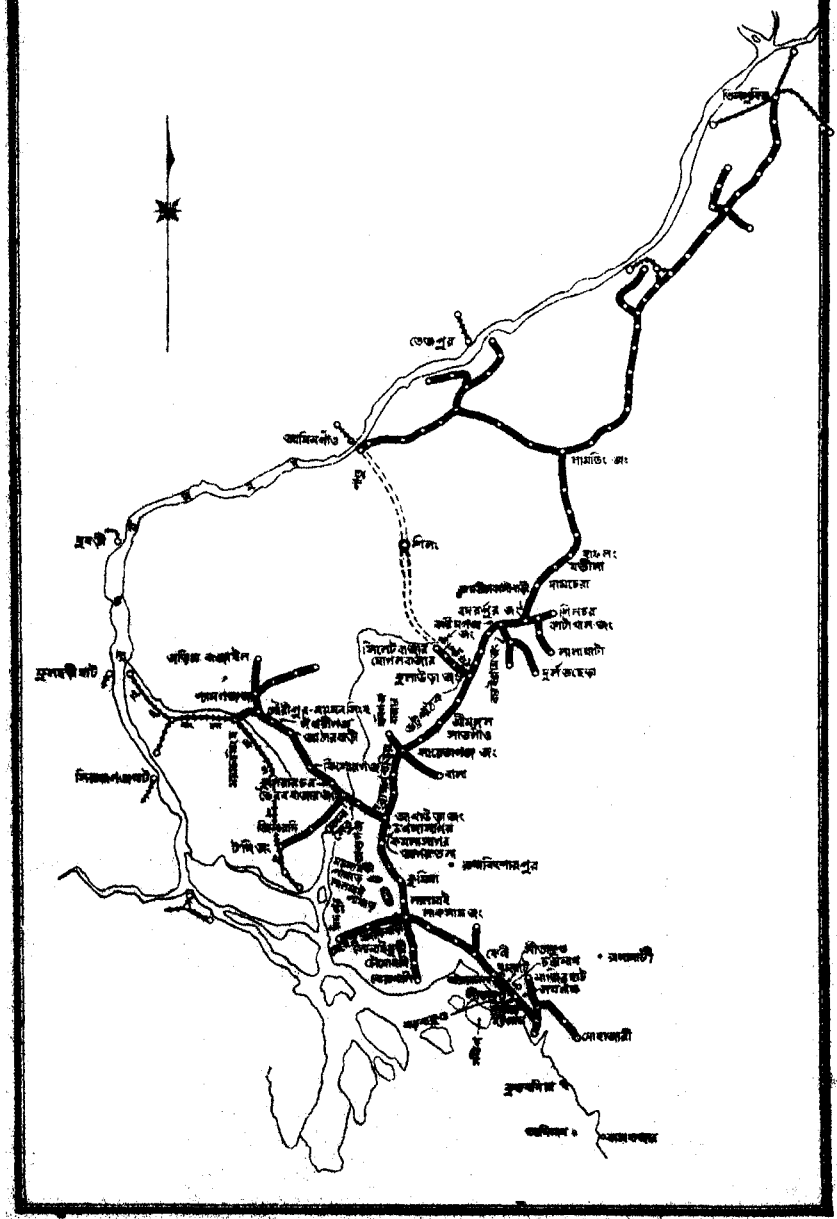
(৬) পার্ব্বতীপুর জংশন—কাটিহার জংশন।

দিনাজপুর জংশন—কলিকাতা হইতে ২৫২ মাইল ও পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ১৮ মাইল দূর। জেলার সদর শহর দিনাজপুর পুনর্ভবা নদীর তীরে অবস্থিত। দিনাজপুর অতি পুরাতন স্থান। অনেকে অনুমান করেন যে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি বা উত্তরবঙ্গের কোন বর্ষ, বিষয় বা পরগণার অধিকাংশ দিনাজপুরের নিকটে অবস্থিত ছিল। এখানে মহারাজা উপাধিধারী উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থজাতীয় একটি পুরাতন জমিদার বংশের বাস। কাহারও কাহারও মতে দিনাজ বা দিনরাজ নামক জনৈক ব্যক্তি এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার নাম হইতেই এই স্থানের নাম দিনাজপুর হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে রাজা গণেশ দত্ত খান বা ইতিহাসবিশ্রুত রাজা গণেশই দিনাজপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীমন্ত দত্ত চৌধুরী দিনাজপুরের রাজা বা জমিদার ছিলেন। কথিত আছে, কালিকার উপাসক এক ব্রহ্মচারী বিগ্রহসহ বহু সম্পত্তি শ্রীমন্ত দত্ত চৌধুরীকে দিয়া যান। এই ব্রহ্মচারীর সমাধি দিনাজপুর রাজবাড়ীর মন্দির দ্বারের নিকটে অবস্থিত। শ্রীমন্তের একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যু হওয়ায় তাঁহার দৌহিত্র শুকদেব ঘোষ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। শুকদেবের পুত্র রাজা প্রাণনাথ রায় অতি বিখ্যাত ছিলেন। কান্তনগরের সুবিখ্যাত কান্তজীর মন্দির ইঁহারই অমরকীর্ত্তি। দিনাজপুর হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ রোড নামক রাজপথের পার্শ্বে ইঁহার দ্বারা খনিত "প্রাণসাগর" নামে একটি দীঘি দেখিতে পাওয়া যায়।

দিনাজপুর শহরটি রাজগঞ্জ, কাঞ্চনঘাট, পাহাড়পুর ও ফুলহাট এই কয় অংশে বিভক্ত। দিনাজপুরের থানার নিকটবর্ত্তী মশানকালীর মন্দির একটি প্রাচীন স্থান। দিনাজপুরের রাজবাড়ীটিও খুব পুরাতন। ইহার দুই দিকে পরিখার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ভূমিকম্পে পুরাতন প্রাসাদটির সমূহ ক্ষতি হইলে মহারাজা স্যার গিরিজানাথ রায় বহু অর্থ ব্যয়ে আধুনিক যুগের উপযোগী করিয়া উহার আমূল সংস্কার করান। বাণগড় হইতে আনীত বহু প্রাচীন কীর্ত্তি রাজবাড়ীতে রক্ষিত আছে। মহারাজার বৈঠকখানার সম্মুখে একাদশ খৃষ্টাব্দের একটি বৌদ্ধ চৈত্য, একটি শিব-মন্দির ও একটি কারুকার্য্যখচিত স্তম্ভ আছে। চৈত্যটি দেখিতে মন্দিরের মত; ইহার চারিদিকে বুদ্ধদেবের জীবনের চারিটি প্রধান ঘটনার অর্থাৎ জন্ম, গৃহত্যাগ, বুদ্ধত্বলাভ ও নির্ব্বাণের চিত্র আছে। স্তম্ভটি কষ্টিপাথর বা ব্রহ্মশিলা নির্ম্মিত, ইহার নিম্নভাগে যে লিপি আছে তাহা হইতে জানা যায় যে ৮৮৮ শকাব্দে (৯৬৬ খৃষ্টাব্দে) কাম্বোজবংশজাত গৌড়দেশের জনৈক রাজা একটি শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাই বাংলায় কাম্বোজ অধিকারের একমাত্র নিদর্শন। দিনাজপুর রাজ-বংশের ঠাকুরবাড়ীতেও বাণগড় হইতে আনীত অনেকগুলি পুরাতন পাথরের খোদাই করা চৌকাঠ আছে। ইহাদের মধ্যে নাগ দরওয়াজা অতি সুন্দর। চৌকাঠের উচ্চতা দেখিলে মনে হয় যে ইহা যে মন্দিরের সহিত সংলগ্ন ছিল তাহা অন্ততঃ এক শত ফুট উচ্চ ছিল। নীচে হইতে দুইটি নাগ পরস্পরকে বেষ্টন করিতে করিতে মাথার উপরে আসিয়া মিলিয়াছে। এরূপ সুন্দর কারুকার্য্য অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। মহারাজার প্রাসাদের সম্মুখে একটি পুরাতন দীঘির পাড়ে অনেকগুলি পুরাতন কামান আছে, তাহার মধ্যে দুই একটি ফরাসীজাতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

দিনাজপুর হইতে পরিষ্কার দিনে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও হিমালয়ের অন্যান্য তুষারাবৃত শিখর মাঝে মাঝে দেখা যায়। কালীতলা মহাল্লায় মশানকালী নামে একটি পুরাতন কালী আছেন। ইহার নিকট দিনাজপুর রাজাদিগের পুরাতন বিচারালয় ছিল এবং মশানকালীর সম্মুখে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে

বলি দেওয়া হইত বলিয়া কথিত। দিনাজপুর স্টেশনের সম্মুখে বিস্তৃত ময়দানটি অতি সুন্দর। দিনাজপুর হইতে মুর্শিদাবাদ রাস্তা ধরিয়া চমৎকার আম্রবীথির মধ্য দিয়া সাড়ে তিন মাইল পথ যাইলে রামসাগর নামে একটি সুন্দর দীঘি দৃষ্ট হয়।

কান্তনগর—দিনাজপুর হইতে ঠাকুরগাঁও পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার পার্শ্বে দিনাজপুর শহর হইতে ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত কান্তনগর একটি পুরাতন স্থান। এখানে একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। প্রবাদ, ইহা মহাভারতোক্ত মৎস্যরাজ বিরাটের দুর্গ। এই দুর্গটি প্রায় এক মাইল স্থান জুড়িয়া অবস্থিত। ইহার ভিতরে দুই তিনটি ঢিবি আছে; ইহার উচ্চ প্রাকারগুলি জঙ্গলের দ্বারা সমাচ্ছন্ন। এই স্থান হইতে লইয়া গিয়া বহু প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন দিনাজপুর রাজবাড়ীতে রক্ষিত হইয়াছে। কান্তনগরের কান্তজীর মন্দিরটি একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু। ইহা একটি নবরত্ন মন্দির ছিল। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরের রাজা প্রাণনাথ রায় দিল্লী হইতে কান্তজীর বিগ্রহ আনাইয়া এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বুখানান্ হ্যামিলটন্ ইহাকে বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দির বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ইহার প্রভূত ক্ষতি হয়। পরে মহারাজা গিরিজানাথ ইহার সংস্কার করেন। এই মন্দিরটি যে কিরূপ সুন্দর ছিল তাহা ইহার পুরাতন চিত্র দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে। ইহার গাত্র সংলগ্ন ইষ্টকে রামায়ণ ও মহাভারতের এবং অন্যান্য নানা বিষয়ের চিত্রাবলী উৎকীর্ণ আছে। এগুলি কৃষ্ণনগরের কারিগরের কাজ। প্রতি বৎসর রাসযাত্রার মেলা উপলক্ষে এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। কান্তনগরের মাটির জিনিস উত্তরবঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ। মেলার সময়ে লোকশিল্পের নিদশন স্বরূপ দ্রব্যাদি এখনও পাওয়া যায়।

বাণগড়—দিনাজপুর হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণে দিনাজপর রোড নামক রাস্তার পার্শ্বে পুনর্ভবা নদীর তীরে অবস্থিত গঙ্গারামপুরও একটি পুরাতন স্থান। ইহার নিকটে ধলদীঘি ও কালদীঘি নামে দুইটি পুরাতন দীর্ঘিকা আছে। মুসলমান আমলে গঙ্গারামপুরে একটি সীমান্তরক্ষী সেনানিবাস বা ছাউনি ছিল এবং সেই সময়ে এই স্থানের নাম ছিল দমদমা। ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে এখানে একটি মুন্সেফী আদালত ছিল। কাহারও কাহারও মতে এই দমদমাই কোটিবর্ষের অন্তর্গত প্রাচীন কোটিকপুর বা দেবকোটনগরী। বরেন্দ্রভূমির উত্তরভাগ বহুকাল ধরিয়া কোটিবর্ষ নামে পরিচিত ছিল। কোটিকপুরে জৈন মহামুনি জম্বুস্বামীর সমাধি ছিল। এখানকার রাজপুরোহিত সোমশর্ম্মার পুত্র ভদ্রবাহু জৈনদের ছয়জন শ্রুতকেবলীর শেষ শ্রুতকেবলী ও মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের গুরু ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে চন্দ্রগিরি পর্ব্বতে তিনি দেহ রক্ষা করেন।

গঙ্গারামপুরের দেড় মাইল উত্তরে পুনর্ভবা নদীর পূর্ব্বতীরে বাণনগর বা বাণগড়ের বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে এই ধ্বংশাবশেষ গুলিতে খনন কার্য্য চলিতেছে। এই কার্য্য সম্পূণ হইলে মূল্যবান ঐতিহাসিকতথ্য পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমিত হয়। প্রবাদ এই স্থানে অসুররাজ বাণের একটি দুর্গ ছিল। বাণরাজার সহস্র বাহু ছিল এবং শিবের বরে তিনি যুদ্ধে অজেয় ছিলেন বলিয়া পুরাণে বর্ণিত আছে। তাঁহার কন্যা উষার সহিত শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ঘটে ও ৯৯৮ খানি হাত কাটা যায়। বাণগড়ের বহু প্রাচীন কীর্ত্তি যে দিনাজপুর রাজবাটিতে রক্ষিত আছে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই স্থান হইতে প্রস্তর ও ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া নিকটবর্ত্তী

বহু লোকে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছে। অরণ্য মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ড এখনও এই স্থানের প্রাচীন সমৃদ্ধির স্মৃতি বহন করিতেছে। প্রবাদ, গঙ্গারামপুরের কালদীঘি বাণরাজার মহিষী কালারাণীর দ্বারা খনিত। ধলদীঘির আকৃতি দেখিয়া মনে হয় যে ইহা মুসলমান আমলে খনিত। গঙ্গারামপুর হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে তালদীঘি নামে একটি প্রকাণ্ড জলাশয় আছে; ইহাকে একটি হ্রদ বলিলেও চলে। ইহা বাণরাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত। এই স্থানেও বাণরাজার স্মৃতি বিজড়িত ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

বাণগড়ে পালবংশীয় প্রথম মহীপালদেবের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে; ইহা হইতে জানা যায় যে বাহুবলে তিনি হৃত পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া "অবনীপাল" হইয়াছিলেন। তাম্রশাসন খানির দূতক তাঁহার মন্ত্রী বামনভট্ট।

মহীপাল দীঘি—দিনাজপুর হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মালদহ রোড নামক রাস্তার পার্শ্বে পালবংশের গৌরব মহারাজা প্রথম মহীপাল দেবের দ্বারা খনিত মহীপাল দীঘি নামক একটি প্রকাণ্ড সরোবর আছে। ইহা ৩,৮০০ ফুট লম্বা ও ১,১০০ ফুট চওড়া। ইহার তীরে পূর্ব্বে দেবালয় ও অট্টালিকাদি ছিল; এখনও তাহার ধ্বংসাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই দীঘিতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাগুর মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পাড়গুলি খুব উচচ ও দূর হইতেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দিনাজপুর জেলার মধ্যে ইহা একটি মনোরম স্থান। ইহার নিকটে মহীপুর নামক গ্রাম অবস্থিত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে টমাস নামে এক পাদ্রী মহীপাল দীঘির ধারে একটি নীলকুঠি স্থাপন করেন।

মহীপাল দীঘি হইতে প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণে বংশীহরি থানার অন্তর্গত টাঙ্গন নদীর তীরে মদনাবাটি গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ পাদ্রী কেরি সাহেবও একটি নীলকুঠি স্থাপন করেন। এই স্থানে তিনি একটি ছাপাখানা স্থাপন করিয়া একটি ধর্ম্ম বিষয়ক বা সাময়িক পত্রিকা বাহির করিতেন। কেহ কেহ বলেন ইহাই বাংলার সর্ব্ব প্রথম ছাপাখানা।

দিনাজপুর জংশন হইতে একটি শাখা লাইন দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী রুহিয়া নামক স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছে।

সিতাবগঞ্জ—দিনাজপুর জংশন হইতে ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী এই ষ্টেশনটি চিনির কল, চাউলের কল প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই স্থানে স্বামী দেবানন্দ নামক জনৈক সাধুর প্রতিষ্ঠিত বাসুদেব ও অন্নপূর্ণার মন্দির আছে।

শিবগঞ্জ—দিনাজপুর জংশন হইতে ৩৭ মাইল দূর। শিবগঞ্জের হাট এ অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ষ্টেশন হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে নেকমরদ গ্রাম। নেকমর্দ্দন্ নামে একজন মুসলমান সাধুর সমাধি এই স্থানে অবস্থিত বলিয়া ইহার নাম নেকমরদ হইয়াছে। ইঁহার সম্মানে প্রতিবৎসর এখানে একটি বৃহৎ মেলা বসে। বাংলা দেশের মধ্যে ইহা অন্যতম বৃহৎ মেলা। গবাদি বহুজন্তু এই মেলায় বিক্রয় হয়; হাতী, উট, দুম্বাও আসিয়া থাকে। পূর্ব্বে ভুটিয়া ও তিব্বতীয়গণ এই মেলায় আসিত এবং এখানে বিখ্যাত টাঙ্গন বা ভুটিয়া ঘোড়া পাওয়া যাইত। এই মেলায় লোকশিল্পের নিদর্শন স্বরূপ দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।

নেকমরদ গ্রাম হইতে পশ্চিমে পূর্ণিয়া জেলার কিষণগঞ্জ মহকুমার সূর্য্য পরগণার দক্ষিণ পর্য্যন্ত "মামু ভাগিনার আইল" নামে একটি সুদীর্ঘ বাঁধ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সম্বন্ধে গল্প প্রচলিত আছে যে আঙ্গুরবাসা গ্রামের একটি বালিকাকে এক মামা ও তাহার ভাগিনা উভয়েই ভালো বাসিত ও বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল; কথিত আছে যে মামা ও ভাগিনা আঙ্গুরবাসা হইতে বিপরীত দিকে ৩০ মাইল দূরে বাস করিত এবং বালিকার প্রেম লাভার্থ নিজ নিজ স্থান হইতে আঙ্গুরবাসা পর্য্যন্ত একটি নূতন পথ নির্ম্মাণ করিতে থাকে; উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি পথে বালিকার নিকট উপস্থিত হওয়া যে পথে পূর্ব্বে কোন মানুষ চলে নাই। অলৌকিক ক্ষমতাবলে এক রাত্রির মধ্যে রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দুজনে নাকি একই সময়ে বালিকার নিকট উপস্থিত হয় এবং বালিকা মনস্থির করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করে। মতান্তরে পথ প্রস্তুত করিতে এত দেরী হইয়াছিল যে বালিকা অপেক্ষা না করিয়া অন্য একজনকে বিবাহ করে।

ঠাকুরগাঁও রোড—দিনাজপুর জংশন হইতে ৪০ মাইল দূর। স্টেশন হইতে দিনাজপুর জেলার অন্যতম মহকুমা ঠাকুরগাও পূর্ব্বে দিকে প্রায় ৪ মাইল দূর। স্টেশনে ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়। ঠাকুরগাও টাঙ্গন নদীর তীরে অবস্থিত; নদীর অপর পারে দিনাজপুরের মহারাজা রমানাথের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ও তৎপ্রতিষ্ঠিত একটি পুরাতন গোবিন্দ মন্দির দৃষ্ট হয়। রাজা রমানাথ যাতায়াতের সুবিধার জন্য এই স্থান হইতে পুনর্ভবা তীরে রাজা প্রাণনাথের প্রিয় প্রাসাদ প্রাণনগর পর্য্যন্ত একটি খাল কাটাইয়াছিলেন। ইহা রামদাঁড়া নামে পরিচিত ও এখনও বর্ত্তমান। প্রাণনগরের কোন চিহ্ন এখন নাই। গোবিন্দ মন্দিরের অনতিদূরে দুই মাইল ব্যাপী একটি জঙ্গল বিদ্যমান; মধ্যে মধ্যে ইহাতে ব্যাঘ্রাদি দৃষ্ট হয়।

রুহিয়া—দিনাজপুর জংশন হইতে ৫০ মাইল দূর। স্টেশন হইতে দুই মাইল উত্তর-পশ্চিমে আলোয়াখোওয়া গ্রাম অবস্থিত। ইহার পার্শ্ব দিয়া একটি প্রশস্ত রাজপথ বালিয়াডাঙ্গী, রাণীশঙ্কৈল, বিন্দোল প্রভৃতি হইয়া দক্ষিণে রায়গঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে। রাসপূর্ণিমার সময়ে এই স্থানে পক্ষকাল স্থায়ী একটি বিরাট মেলা হয়। এই মেলায় ঘোড়া, উট, গোরু, মহিষ, ছাগল, দুম্বা প্রভৃতি বিক্রয় হয়। বিহার, পাঞ্জাব, ভুটান প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বিক্রয়ের জন্য জন্তুগুলি লইয়া আসা হয়। মেলার সময়ে রুহিয়া স্টেশন হইতে মোটর বাস ও গোরুর গাড়ী পাওয়া যায়। উট ও দুম্বা বেশীর ভাগ বকরূঈদে কুর্ব্বাণীর জন্য ক্রীত হয়। নেকমরদের মেলা হইতেও এই মেলা বড়।

রুহিয়া হইতে প্রায় এক মাইল পূর্ব্বদিকে করম খাঁর গড় নামক একটি পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়; দুর্গটি দেখিলে ইহার সামরিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার উত্তরে ইহার চেয়ে বড় একটি হিন্দু রাজার দুর্গেরও ভগ্নাবশেষ আছে; কথিত আছে দুই পক্ষে বহু দিন ধরিয়া যুদ্ধ হইয়াছিল।

বাঙ্গালবাড়ী—কলিকাতা হইতে ২৭৮ মাইল দূর। স্টেশনের পার্শ্বেই একটি চাউলের কল আছে। স্টেশনের ৩ মাইল উত্তরে হেমতাবাদে পীর বদর উদ্দীনের একটি পুরাতন সুন্দর সমাধি আছে; ইহার নির্ম্মাণে হিন্দু বাটীর ভগ্নাবশেষ লওয়া হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ইহার অনতিদূরে হুসেন শাহের তখত্ নামে একটি চতুষ্কোণ পিরামিড দৃষ্ট হয়, ইহার মধ্যেও দুইটি সমাধি আছে। নিকটে মহেশ রাজার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষও দৃষ্ট হয়। অনুমিত হয়, সুলতান হুসেন শাহ এই মহেশ রাজাকে পরাজিত করিয়া জয়চিহ্ন স্বরূপ পিরামিডটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রায়গঞ্জ হইতেও হেমতাবাদে আসা যায়। উত্তর-পূর্ব্বে ৮ মাইল দূর ও রাস্তা আছে।

রায়গঞ্জ—কলিকাতা হইতে ২৮৪ মাইল দূর। ইহা দিনাজপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ কারবারের স্থান এবং ধান ও পাটের একটি বড় গঞ্জ। এখানে একটি মুনসেফী আদালত আছে।

রায়গঞ্জ হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণে মহানন্দাকূলে চূড়ামন গ্রামে একঘর বর্দ্ধিষ্ণু ও প্রাচীন জমিদার বংশের বাস। নদীতীরে তাঁহাদের বাড়ীটি অতি সুন্দর।

বারসোই জংসন—কলিকাতা হইতে ২৯৭ মাইল দূর। রায়গঞ্জের ঠিক পরের ও ইহার আগের স্টেশন কাচনা হইতে পূর্ণিয়া জেলা তথা বিহার প্রদেশ আরম্ভ। মহানন্দার পূর্ব্ব তীরে বারসোই একটি বাণিজ্য কেন্দ্র। স্টেশন হইতে নদীর তীরের মালগুদাম পর্য্যন্ত একটি সাইডিং চলিয়া গিয়াছে। এখান হইতে একটি শাখা লাইন ৩৫ মাইল দূরবর্ত্তী কিষণগঞ্জ জংশন পর্য্যন্ত গিয়াছে।

ডালকোলহা—বারসোই জংশন হইতে ১৮ মাইল দূর। স্টেশনের প্রায় ৪ মাইল উত্তরে মহানন্দার পূর্ব্বকূলে অসুরগড় নামে একটি প্রাচীন উচচ দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে অসুর, বেণু, বারজান, নানহা ও কান্হা নামে পাঁচ ভাই নিজেদের বাসের জন্য রাতারাতি পাঁচটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কিষণগঞ্জ মহকুমার উত্তর অংশে বেণু ও বারজানের নামে দুটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। অসুর গড়ে এক জন মুসলমান পীরের সমাধিতে দিনাজপুরের নেকমরদের মেলার পর বহু লোক আসিয়া থাকে।

কিষণগঞ্জ জংশন—বারসোই জংশন হইতে ৩৫ মাইল দূর। ইহা পূর্ণিয়া জেলার একটি মহকুমা। সীমান্ত ভূমিতে যেরূপ হইয়া থাকে এই মহকুমার স্থানীয় মিশ্র ভাষা কিষণগঞ্জিয়া বা সিরিপুরিয়া প্রধানতঃ বাংলা হইলেও উহাতে মৈথিলীর কিছু কিছু মিশ্রণ আছে এবং সাধারণতঃ কায়েথী অক্ষরে ইহা লিখিত হয়। দার্জিজলিং রেলপথের একটি শাখা শিলিগুড়ি হইতে এখানে আসিয়া পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের সহিত মিশিয়াছে।

কিষণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত খাগড়া গ্রামে একটি পুরাতন নবাববংশের বাস আছে, ইঁহারা পূর্ণিয়া জেলার প্রসিদ্ধ জমিদার। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ খাঁ দস্তর শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হুমায়ুনকে সাহায্য করায় তাঁহার সনদ বলে ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে সূর্য্যপুর পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হন। খাগড়ার নবাবদিগকে দেশ রক্ষার জন্য নেপালী প্রভৃতি আক্রমণকারীদের সহিত বহু বার যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। খাগড়ার প্রসিদ্ধি এখানকার বৃহৎ মেলার জন্য। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে নবাব আতাহুসেন খাঁ এই মেলার আরম্ভ করেন। তদবধি শীতকালে একমাস ব্যাপী এই মেলায় বহু লোক যোগ দিয়া আসিতেছেন। অসংখ্য গোরু, ঘোড়া, হাতী, উট এবং নানারূপ কৃষিজাত দ্রব্য এই মেলায় বিক্রয় হয়।

কাটিহার জংশন—কলিকাতা হইতে পাবর্ব্বতীপুর জংশন হইয়া ৩৪০ মাইল ও লালগোলা ঘাট হইয়া ২৬৪ মাইল দূর। ইহা পূর্ণিয়া জেলার অধীন একটি বিখ্যাত বাণিজ্য স্থান। এখানকার গঞ্জটি বেশ বড়। আটা, ময়দা, তৈল ও পাটের কয়েকটি কল এখানে আছে এবং এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল, ময়দা ও তৈলবীজ (সরিষা, তিল প্রভৃতি) চালান যায়। এই স্থানের পুরাতন

নাম সৈফগঞ্জ। কথিত আছে প্রায় পৌনে দুইশত বৎসর পূর্ব্বে পূর্ণিয়ার নবাব সৈফ খাঁ কর্ত্তৃক এখানকার গঞ্জটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাটিহার একটি বড় জংশন স্টেশন। এখানে পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলপথের সহিত বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম (বেঙ্গল এণ্ড নর্থ ওয়েষ্টার্ণ) রেলপথের সংযোগ ঘটিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের এক শাখা এই স্থান দিয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী মণিহারিঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং অপর একটি শাখা লাইন ৬৭ মাইল দূরবর্ত্তী নেপালরাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত যোগবণী পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখাপথে পূর্ণিয়া জংশন, জালালগড়, আরারিয়া কোর্ট, ফরবেশগঞ্জ ও যোগবণী উল্লেখযোগ্য স্টেশন। পূর্ণিয়া জংশন হইতে আর একটি শাখা লাইন ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত মুরলীগঞ্জ ও বিহারীগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে।

মণিহারি ঘাট—কাটিহার জংশন হইতে ১৭ মাইল দূর। এই স্থানটি গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এখানে পূর্ব্ব-ভারত রেলপথের খেয়া জাহাজে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্ব-ভারত রেলপথের সকরিগলিঘাট স্টেশনে যাওয়া যায়। গ্রহণ, বারুণী, কার্ত্তিকী-পূর্ণিমা, মাঘী-পূর্ণিমা ও শিবরাত্রির সময় গঙ্গা স্নানের জন্য মণিহারি ঘাটে বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

মণিহারির নিকটে ছোট পাহাড় নামে একটি পাহাড় আছে। ইহার উচ্চতা আড়াই শত ফুটের অধিক নহে। এই পাহাড়ে কতকগুলি কারুকার্য্য খচিত প্রস্তর স্তম্ভ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে পূর্ব্বে এই পাহাড়ের উপর হয়ত কোন হিন্দু দেবমন্দির ছিল। এখন এই পাহাড়ের উপর একজন মুসলমান পীরের সমাধি আছে।

মনিহারির নিকটবর্ত্তী বলদিয়াবাড়ী নামক গ্রামের প্রান্তরে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসন লইয়া সিরাজউদ্দৌলা ও তাঁহার মাসতুতো ভাই পূর্ণিয়ার নবাব শওকত জঙ্গের মধ্যে এক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার বাঙ্গালী সেনাপতি মোহনলাল ও শ্যামসুন্দর প্রভৃত পরাক্রম প্রদর্শন করেন। যুদ্ধে শওকত জঙ্গের মৃত্যু ঘটে।

পূর্ণিয়া জংশন—কাটিহার জংশন হইতে যোগবণী শাখা পথে ১৭ মাইল দূর। জেলার সদর শহর পূর্ণিয়া সরুয়া নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। মুসলমান শাসনকালে পূর্ণিয়া প্রথমে একটি "সরকার" ও পরে মুঘলযুগে "ফৌজদারির" সদর শহর ছিল। সেই সময়ের কতকগুলি ভগ্ন অট্টালিকা ও ভগ্নপ্রায় মসজিদ পূর্ণিয়া শহরের মিয়াবাজার, খলিফা চক্, বেগম দেউড়ি ও লালবাগ প্রভৃতি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন পূর্ণিয়া শহর নদীর অপর পারে ছিল। নদীর উপরকার একটি সেতুর দ্বারা এই দুই শহর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত।

পূর্ণিয়া জংশন হইতে একটি শাখা লাইন বাহির হইয়া ২৩ মাইল দূরবর্ত্তী বনমনখি জংশনে গিয়া পুনরায় দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া এক শাখা মুরলীগঞ্জ ও অপর শাখা বিহারীগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে। কাটিহার জংশন হইতে মুরলীগঞ্জ ও বিহারীগঞ্জের দূরত্ব যথাক্রমে ৫২ মাইল ও ৫৭ মাইল।

বনমনখি স্টেশন হইতে ২ মাইল উত্তরে ধরারা গ্রামে একটি পুরাতন গড়ের ভগ্নাবশেষ ও তন্মধ্যে প্রায় ২০ ফুট উচ্চ একটি মসৃণ পাথরের থাম দৃষ্ট হয়। থামটি মাণিক থাম নামে পরিচিত। পল্লী কাহিনীতে গড়টি হিরণ্যকশিপুর প্রাসাদ ছিল বলিয়া কথিত এবং থামটিতে তাঁহার পুত্র প্রহ্লাদকে

বাঁধিয়া বধ করিবার উপক্রম করিলে স্বয়ং ভগবান্ নৃসিংহ রূপ ধরিয়া থামটির শীর্ষদেশ হইতে বাহির হইয়া ভক্তকে রক্ষা করেন। এই থামের উপর পূর্ব্বে একটি সিংহ মূর্ত্তি ছিল বলিয়া কথিত। গড়টির পাশ দিয়া যে ছোট নদীটি চলিয়া গিয়াছে তাহার নাম হিরণ্য নদী।

জালালগড়—কাটিহার জংশন হইতে ২৯ মাইল দূর। ষ্টেশনের অতি নিকটে একটি পুরাতন ভগ্ন দুর্গ আছে। দুর্গটি সমচতুষ্কোণ, ইহার উচ্চ প্রাচীরগুলি এখনও বিদ্যমান আছে। খাগড়ার নবাব বংশের রাজা সৈয়দ মহম্মদ জলাল উদ্দীন কর্ত্তৃক সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহা নির্ম্মিত হয়। নেপালী গুর্খাগণের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিবার জন্যই প্রত্যন্ত প্রদেশে এই দুর্গটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। জালালগড় স্থানটি বেশ স্বাস্থ্যকর। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পূর্ণিয়া জেলার সদর এই স্থানে স্থানান্তরিত করিবার কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ উহা আর ঘটিয়া উঠে নাই।

আরারিয়া কোর্ট—কাটিহার জংশন হইতে ৪১ মাইল দূর। ইহা পূর্ণিয়া জেলার একটি মহকুমা। এই স্থানের পূর্ব্ব নাম বসন্তপুর। এই শহরটি পনার নামক নদীর তীরে অবস্থিত।

ফরবেসগঞ্জ—কাটিহার জংশন হইতে ৫৯ মাইল। ইহা পূর্ণিয়া জেলার একটি বাণিজ্য প্রধান স্থান। পাটই এখানকার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। এ, জে, ফরবেস নামক জনৈক সাহেব জমিদারের নাম হইতে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। স্থানটি বেশ স্বাস্থ্যকর। শীতকালের দিনে আকাশ পরিষ্কার থাকিলে এখান হইতে হিমালয় পর্ব্বতের তুষার শুভ্র শৃঙ্গগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

যোগবণী—কাটিহার জংশন হইতে ৬৭ মাইল দূর। এই স্থানটি ব্রিটিশ অধিকারের শেষ সীমানায় অবস্থিত। ষ্টেশনের এলাকার বাহির হইতেই স্বাধীন নেপাল রাজ্যের সীমানা আরম্ভ হইয়াছে। এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। ইহার অদূরে তরাইএর গভীর অরণ্য ও হিমালয় পর্ব্বতের সানুদেশ। ইহা নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করিবার অন্যতম সিংহদ্বার।

যোগবণী হইতে নেপাল রাজ্যের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ তীর্থ বরাহছত্র ও ৫১ মহাপীঠের অন্যতম বলিয়া কথিত দন্তপীঠে যাওয়া যায়। এই দুইটি তীর্থ পরস্পরের অতি নিকটে অবস্থিত। যোগবণী হইতে এই স্থানের দূরত্ব প্রায় ৪০ মাইল। কোশী বা কৌশিকী নদীর তীর দিয়া পার্ব্বত্য পথে যাইতে হয়। দন্তপীঠে সতীর অধোদন্ত পড়িয়াছিল, এখানে দেবীর নাম বারাহী, ভৈরব মহারুদ্র। বরাহছত্রে বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার বরাহের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। একটি পর্ব্বতশৃঙ্গের পাদদেশে এই তীর্থ অবস্থিত। প্রতিবৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমার সময় এখানে মহামেলা হয় ও সেই সময়ে যোগবণী হইতে ইহার নিকটবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত মোটরবাস যাতায়াত করে।
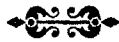
(চ) সান্তাহার জংশন—বগুড়া—কাউনিয়া জংশন ও পার্ব্বতীপুর জংশন—লালমণিরহাট জংশন—গোলকগঞ্জ জংশন।

আদমদীঘি—কলিকাতা হইতে ১৭৮ মাইল। এই স্থানে বাবা আদম নামে একজন অদ্ভুত শক্তি-সম্পন্ন ফকির বাস করিতেন। নাটোরের রাণী ভবানী তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং এই স্থানে একটি দীঘি খনন করাইয়া ফকিরের নামে উৎসর্গ করেন; দীঘির পাড়ে বাবা আদমের দরগাহে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই পূজা দিয়া থাকেন। এই দীঘি ও বাবা আদমের নাম হইতে গ্রামটির নাম হইয়াছে আদমদীঘি। আদমদীঘির থানা হইতে ৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে দেওড়া গ্রামে একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। গ্রামের মধ্যে ৮৮টি পুরাতন জলাশয় আছে। দেওপাল নামক রাজার প্রাসাদ এখানে ছিল বলিয়া কথিত। আদমদীঘির পূর্ব্ব পার্শ্বে তালশন গ্রাম সারস্বত ব্যাকরণের টীকাকার পণ্ডিত রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের জন্মস্থান। ইঁহার টীকার নাম "কৃতভাষ্য"। ইঁহার বংশীয় কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্যও সারস্বত ব্যকরণের "ঋজুদীপিকা ও প্রভাবতী" নামে এক খানি টীকা রচনা করেন। এই বংশে বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

আদমদীঘি থানার অন্তর্গত ছাতিন বা ছাতিয়ান গ্রামে পুণ্যশ্লোকা রাণী ভবানীর জন্মস্থান। তিনি যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেন সেই স্থানে তাঁহার মাতার নামে জয়দুর্গার মন্দির স্থাপিত আছে। ছাতিন গ্রামের সিদ্ধেশ্বরী পীঠ এ অঞ্চলে পবিত্র বলিয়া পূজিত হয়। কথিত আছে, সিদ্ধেশ্বরী পুকুরের পাড়ে তপস্যা করিয়া আত্মারাম চৌধুরী মহাশয় রাণী ভবানীর মত কন্যারত্ন লাভ করেন। এই গ্রাম হইতে নীল সরস্বতী, বাসুদেব ও সূর্য্যমূর্ত্তি রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমতির চিত্রশালায় স্থান পাইয়াছে।

নসরৎপুর—কলিকাতা হইতে ১৮০ মাইল। ষ্টেশনের দুই মাইল দক্ষিণে কড়ই বা কড়ইবদুল গ্রামে ময়মনসিংহ গৌরীপুরের জমিদার বংশের পূর্ব্ব বাস ছিল। আরও দুই মাইল দক্ষিণে ঝাঁকইর গ্রামে ময়মনসিংহ মুক্তাগাছার জমিদারগণের পূর্ব্ব বাস ছিল; তাঁহাদের প্রকাণ্ড প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। ঝাঁকইরের এক মাইল পূর্ব্বদিকে কাঞ্চনপুর গ্রামে একঘর কায়স্থ জমিদারের বাস আছে। ইহার পার্শ্বস্থ চাঁপাপুর গ্রামও বিশেষ প্রসিদ্ধ; তালোড়া ষ্টেশন হইতেও চাঁপাপুর যাওয়া যায়; তথা হইতে ৫ মাইল দূর। এ অঞ্চল এক কালে মজনু ফকির নামক দুর্দ্দান্ত দস্যুর অত্যাচারে বিশেষ উপদ্রুত হইয়াছিল। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে একদল নাগা সন্ন্যাসী পশ্চিম অঞ্চল হইতে ময়মনসিংহ গোয়ালপাড়া অভিমুখে যাইবার সময়ে মজনু ফকিরের দলের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হন। চাঁপাপুরের নিকট ফকিরকাটা বিলের পাশে দুই দলে যুদ্ধ হয় এবং মজনু দলশুদ্ধ নিহত হয়। মজনু ফকিরের অত্যাচার বর্ণনা করিয়া "মজনুর কবিতা" নামে একটি গাথা এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে; তাহা হইতে কিছু নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

> কালান্তক যম বেটা কে বলে ফকির।
> যার ভয়ে রাজা কাঁপে প্রজা নহে স্থির।
> সাহেব সুবার মত চলন সুঠাম।
> আগে চলে ঝাণ্ডাবন ঝাউল নিশান॥
>
> বগুড়ার ইতিহাস, প্রভাস চন্দ্র সেন, ১৩৭ পৃষ্ঠা।

তালোড়া—কলিকাতা হইতে কিঞ্চিদধিক ১৮৬ মাইল। ষ্টেশনের ৪ মাইল উত্তরে দুপচাঁচিয়া একটি পুরাতন ও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম।

তালোড়া স্টেশন হইতে ২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কুন্দগ্রাম বা কুণ্ডগ্রামে "অদ্ভুত রামায়ণের" গ্রন্থকার অদ্ভুতাচার্য্য বা নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। এই রামায়ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষা অনেক বৃহৎ।

কাহালু—কলিকাতা হইতে ১৯২ মাইল। এখানকার আচার বংশীয় কায়স্থ জমিদারগণ প্রতিষ্ঠিত একটি পুরাতন শিবমন্দিরে এয়োদশটি গৌরীপাটের উপর শিব স্থাপিত। কাহালু হইতে অনতিদূরে এই থানার অন্তর্গত লক্ষ্মীচাপড়া গ্রামে বিশিষ্ট নৈয়ায়িক পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গদাধর ভট্টাচার্য্য খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নব্যন্যায়ের ব্যাখ্যা 'গদাধরী" এখনও আদৃত হয়। তিনি বহু টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এগুলি "গদাধরী পাতড়া" নামে পরিচিত। ইঁহার বংশীয় মহামহোপাধ্যায় ভুবন মোহন বিদ্যারত্ন ও মধুসূদন স্মৃতিরত্নও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

বগুড়া—কলিকাতা হইতে ১৯৯ মাইল দূর। জেলার সদর শহর বগুড়া করতোয়া নদীর পশ্চিমতটে অবস্থিত। বগুড়া আধুনিক শহর, ইহা ইংরেজগণ কর্তৃক ১৮২১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এবং তখন হইতেই জেলার সদর শহর। বগুড়ার নবাববাটীই এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য। বগুড়ার ফৌজদারি কাছারির নিকট শহরের বিভিন্ন অংশ হইতে সাতটি রাস্তা আসিয়া একত্রে মিলিত হইয়াছে। এই স্থানকে "সাতশড়ক" বলে। বগুড়ার প্রায় সমুদায় সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সাতশড়কের নিকটে অবস্থিত। বগুড়া শহরে একটি ধর্ম্মশালা ও কয়েকটি হোটেল আছে। বালকবালিকাদের জন্য কয়েকটি উচচ ইংরেজী বিদ্যালয় ও সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ এখানে আছে।

বগুড়ার প্রান্তবাহিনী করতোয়া নদী এককালে প্রবলস্রোতা ছিল এবং প্রাচীন বরেন্দ্র ও কামরূপ রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিত। পূর্ব্বে এই নদীর খাত দিয়াই তিস্তার জলরাশি গিয়া পদ্মায় পড়িত। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের ভীষণ বন্যায় তিস্তা গতি পরিবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বদিকে গিয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হয়। এই বিপর্য্যয়ের পর হইতে করতোয়ার পতন আরম্ভ হয়। অমরকোষে ইহার অপর নাম সদানীরা বলা হইয়াছে এবং গঙ্গা-যমুনার ন্যায় এই নদীও পুণ্যতোয়া। স্কন্দপুরাণ, কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে। স্কন্দপুরাণে "করতোয়া মাহাত্ম্য" নামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে। করতোয়ার অপর নাম সদানীরা নামে একটি নদীর উল্লেখ বেদের অনুগামী শতপথ ব্রাহ্মণেও দৃষ্ট হয়। স্কন্দপুরাণে করতোয়াকে "পৌণ্ড্রগণের প্লাবনকারিনী" বলা হইয়াছে। তাহাতে আরও বর্ণিত আছে যে হরগৌরীর বিবাহকালে গিরিরাজ হিমালয়ের করভ্রষ্ট মন্ত্রপূত জল হইতে এই নদীর উৎপত্তি বলিয়া ইহার নাম "করতোয়া"। স্কন্দপুরাণের মতে বর্ষাকালে অপর সকল নদ নদীই মলিনতা প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের পাবনী শক্তি আর থাকে না ; সেই সময়ে একমাত্র করতোয়াই বিশুদ্ধ সলিল বহন করে এবং তাহার পবিত্রতা অক্ষুন্ন থাকে। গঙ্গাস্নানের ন্যায় পঞ্জিকাগুলিতে করতোয়া-স্নানেরও বিভিন্ন যোগ উল্লিখিত থাকে। মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে যে করতোয়ায় স্নান করিয়া ত্রিরাত্রি উপবাস করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণের পৌণ্ড্রখণ্ড অনুসারে পৌষনারায়ণীযোগে বারাণসীতে পূজা করিলে ত্রিকোটি কুল উদ্ধার লাভ করে, কিন্তু করতোয়া জলে পূজা করিলে তাহার দ্বিগুণ ফল পাওয়া যায়। করতোয়ার শীলাদ্বীপে স্নান করিলে আবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুণ্যসঞ্চয় হয়।

বগুড়ার নিকটবর্ত্তী বৃন্দাবন পাড়া নামক গ্রামে ক্ষৌণী-নায়ক ভীমের জাঙ্গালের কিয়দংশ বিদ্যমান আছে। বগুড়া হইতে মহাস্থানের পথে স্থানে স্থানে এই জাঙ্গাল বা প্রাচীরের চিহ্ন সুস্পষ্ট দেখিতে

পাওয়া যায়। ভীমের জাঙ্গাল বগুড়া শহরের উত্তর-পূর্ব্ব হইতে বৃন্দাবন পাড়া, মহাস্থানগড়, চাঁদমুয়া, কীচক, শালদহ প্রভৃতি হইয়া ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল। লাল মাটির এই জাঙ্গালটি মধ্যে মধ্যে এখনও ২০ ফুট পর্য্যন্ত উচচ। এই জাঙ্গাল বেষ্টিত স্থান ক্ষৌণীনায়ক ভীম প্রতিষ্ঠিত মহাস্থানের উপপুর ছিল বলিয়া কথিত। হান্টার সাহেব ইহাকে ইতালীয় রিং ফোর্ট বা অঙ্গুরীয়ক দুর্গের সহিত তুলনা করিয়াছেন; বিপদের সময়ে নিকটস্থ জনপদের প্রজাগণ কিছুদিনের জন্য ইহার মধ্যে আশ্রয় লইতে পারিত।

বগুড়া হইতে ৫ মাইল দক্ষিণে মাঝিড়া গ্রামে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পণ্ডিত সা নামক একজন বিখ্যাত দস্যুর আড্ডা ছিল; তাহার অত্যাচারে জনসাধারণ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। বগুড়ার উত্তরে কালীতলা হাট গ্রামেও তাহার একটি আড্ডা ছিল। এই দুই গ্রামের কালী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ও পূজা পণ্ডিত সা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়।

বগুড়া হইতে ৬ মাইল উত্তরে করতোয়ার নিকট লাহিড়ীপাড়া গ্রামে "বিষহরি পদ্মপুরাণ" রচয়িতা কবি জীবনকৃষ্ণ মৈত্র মহাশয়ের বাস ছিল। তিনি রাণী ভবানীর সমসাময়িক ছিলেন। বগুড়া অঞ্চলে প্রচলিত "যোগীর কাছ" নামক লোকগীতি জীবনকৃষ্ণের রচনা বলিয়া কথিত।

বগুড়া হইতে ৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে যোগীরভবন নামক গ্রামে নাথপন্থী কাণফট্ যোগীদের একটি দেবপুরী আছে। দেবপুরী মধ্যে ধর্ম্মডুঙ্গি বা ধর্ম্মের মন্দির আছে এবং ইহার গদীঘরে একটি অগ্নিকুণ্ড সবর্বদা জ্বালাইয়া রাখা হয়। দেবপুরীর প্রাচীরের বাহিরে ভৈরব, দুর্গা, সর্ব্বমঙ্গলা, গোরক্ষনাথ প্রভৃতির মন্দির আছে। গোরক্ষনাথের মন্দিরের পার্শ্বে নাথপন্থীদের গুরুর, তাঁহার শিষ্যের ও কুকুরের তিনটি সমাধি আছে। শিবরাত্রি ও জন্মাষ্টমীর সময় এখানে উৎসব হয়।

বগুড়া হইতে ৬ মাইল পূর্ব্বদিকে দুগাহাটা গ্রামে মুসলমান যুগের একটি পুরাতন গড়ের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান।

মহাস্থান গড়—বগুড়া হইতে ৭ মাইল উত্তরে করতোয়া নদীর পশ্চিমতীরে বাংলার প্রাচীন রাজধানী মহাস্থানগড়ের ধ্বংশাবশেষ অবস্থিত। বগুড়া হইতে মহাস্থান পর্য্যন্ত করতোয়া নদীর তীর দিয়া পাকা রাস্তা আছে। বগুড়া হইতে মোটর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী বা এক্কাযোগে মহাস্থানে যাওয়া যায়।

ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে যে মহাস্থান গড় প্রাচীন পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্ররাজ্যের রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা পুণ্ড্রনগর হইতে অভিন্ন। ঐতরেয় আরণ্যক, মহাভারত, হরিবংশ, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে পুণ্ড্রদেশ ও পৌণ্ড্রজাতির উল্লেখ আছে। পুরাণে বর্ণিত আছে যে পুণ্ড্রদেশের রাজা পৌণ্ড্রক বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি নিজেকে বাসুদেব বা ভগবানের অবতার বলিয়া প্রচার করিতেন এবং বাসুদেবত্ব জ্ঞাপক শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মচিহ্ন ব্যবহার করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম ছিল বাসুদেব এবং তিনিও এই সকল চিহ্ন ধারণ করিতেন। এই জন্য পুণ্ড্ররাজ বাসুদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই সকল চিহ্ন ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া পাঠান। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কথা উপেক্ষা করিলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈন্যে দ্বারকাপুরী আক্রমণ ও অবরোধ করেন। ভীষণ যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ কৌশল অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে পৌণ্ড্রদেশবাসিগণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্য্যোধনের পক্ষভুক্ত হইয়া পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিল।

প্রাচীন মানচিত্রে মহাস্থান গড়ের নাম "মুস্তানগড়" রূপে লিখিত আছে। এই স্থানের "মহাস্থান" নাম হওয়া সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম তপস্যা করিবার জন্য একটি উপযুক্ত ও শাস্ত্রানুসারে চতুঃষষ্টি দোষ বিবর্জ্জিত স্থানের অনুসন্ধান করিতে করিতে পুণ্যতোয়া করতোয়ার তীরবর্ত্তী এই স্থানটিকে আবিষ্কার করেন এবং এই স্থানে তপস্যার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া ইহার "মহাস্থান" নাম দেন। স্মরণাতীত কাল হইতে মহাস্থান তীর্থরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। উত্তরকালে এই স্থানে পুণ্ড্ররাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হইলে ইহা পুণ্ড্রনগর, পুণ্ড্রবর্দ্ধন, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নামে পরিচিত হয়। পুণ্ড্রবর্দ্ধন অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। বুদ্ধদেব পুণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি মহাস্থানে আবিষ্কৃত মৌর্য্যযুগের একটি শিলালেখ হইতে জানা যায় যে খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পুণ্ড্রবর্দ্ধন মৌর্য্য সাম্রাজ্য ভুক্ত ছিল। ইহার শাসনকর্ত্তা মহামাত্য নামে অভিহিত হইতেন। ৬৪০ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পর্য্যটক য়ুয়ান চোয়াং কামরূপ হইতে পৌণড্রবর্দ্ধনে আগমন করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে তৎকালে করতোয়া অতি বিস্তৃত নদী ছিল। তিনি ইহাকে ক-লো-তু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধনের পরিধি ছিল ৩০ লী বা ৫ মাইল। তাঁহার বর্ণনায় পুন্-না-ফা-তান-না বা পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন গঙ্গার উপরিস্থ রাজমহল হইতে ৬০০ লী বা ১০০ মাইল পূর্ব্বদিকে। দুইটি স্থানের বর্ত্তমান অবস্থানের সহিত ইহা আশ্চর্য্যরূপে মিলিয়া যায়। ইহা হইতে প্রমাণ করা সহজ হইয়াছে যে মহাস্থান গড়ই প্রাচীন পৌণ্ড্রবদ্ধন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে পুণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে ৯০০ লী বা ১৫০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে যাইয়া কামরূপ রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। য়ুয়ান চোয়াং এই স্থানে ২০টি বৌদ্ধসংঘারাম, একশত হিন্দু-মন্দির ও ছয় হাজার বৌদ্ধশ্রমণকে দেখিয়াছিলেন। তিনি সন্ন্যাসীদের বেশীরভাগ দিগম্বর জৈন নিগন্থ সম্প্রদায়ভুক্ত দেখিয়াছিলেন। তিনি এই নগরীকে জনবহুল, বহু পুষ্করিণী ও পুষ্পোদ্যানসমন্বিত এবং অধিবাসিগণকে অর্থশালী ও বিদ্যানুরাগী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অধিবাসীরা শৈব, বৈষ্ণব, স্কন্দ বা কার্ত্তিকের উপাসক ও বৌদ্ধ, এই কয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। পুরুষেরা টুপী ব্যবহার করিতেন ও স্ত্রীলোকগণ স্কন্ধ পর্য্যন্ত বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিতেন। তৎকালে পুণ্ড্রদেশে বহু পরিমাণে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও নবনী পাওয়া যাইত এবং অধিবাসিগণের স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। মন্দির গুলির মধ্যে গোবিন্দ অথাৎ বিষ্ণু ও স্কন্দের মন্দিরই সর্ব্বপেক্ষা বড় ছিল। কথিত আছে, বুদ্ধদেব ছাড়া জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ স্বামীও ধর্ম্মপ্রচারের জন্য পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে কাশ্মীররাজ জয়াপীড় পুণ্ড্রবর্দ্ধনের ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি শুনিয়া তাহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য ছদ্মবেশে এই নগরীতে উপস্থিত হন। তৎকালে জয়ন্ত পুণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজা ছিলেন। রাজধানীর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া জয়াপীড় বিস্মিত হন। একদিন রাত্রে তিনি স্কন্দমন্দিরে নাচগান শুনিতেছেন, এমন সময়ে প্রধানা নর্ত্তকী কমলা দেখিতে পাইলেন যে তিনি অভ্যাসবশতঃ নিজের অজ্ঞাতসারে কাহারও নিকট হইতে যেন কিছু গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে মধ্যে মধ্যে পশ্চাৎদিকে হস্ত প্রসারণ করিতেছেন। বুদ্ধিমতী কমলা বুঝিলেন যে ইনি নিশ্চয়ই কোন ছদ্মবেশধারী অভিজাত ব্যক্তি। জয়াপীড়কে কিছু না বলিয়া কমলা একখানি স্বর্ণ পাত্রে করিয়া তাম্বুল লইয়া জয়াপীড়ের পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলেন। এবার হস্ত প্রসারণ করিবামাত্রই জয়াপীড় তাম্বুল প্রাপ্ত হইলেন ও হঠাৎ পিছন ফিরিবামাত্র অপরূপ সুন্দরী কমলার সহিত তাঁহার দৃষ্টি বিনিময় হইল। কমলার সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহার গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানে একটি ভীষণ

সিংহের উপদ্রব সুরু হয়। সিংহ অনেককে হত্যা করিল, কিন্তু রাজ্যের বড় বড় সাহসী ব্যক্তিরাও সিংহকে হত্যা করিতে পারিলেন না। ইহাতে চারিদিকেই আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। কমলার মুখে সিংহের অত্যাচারের কথা শুনিয়া জয়াপীড় তাঁহাকে কিছু না বলিয়া রাত্রিকালে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং বহু ধ্বস্তাধ্বস্তির পর সিংহকে হত্যা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন মৃতসিংহের মুখ-বিবর হইতে কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের নামাঙ্কিত একখানি কেয়ূর বাহির হইলে রাজা জয়ন্ত অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; তখনই চারিদিকে জয়াপীড়ের সন্ধানে লোক বহির্গত হইল। কমলার গৃহে জয়াপীড়ের সন্ধান পাইয়া পৌণ্ড্ররাজ জয়ন্ত তাঁহাকে বিশেষ আদরের সহিত নিজের প্রাসাদে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহার সহিত স্বীয় সুন্দরী কন্যা কল্যাণদেবীর বিবাহ দিলেন। জয়াপীড় কমলাকেও বিবাহ করিয়া দুই পত্নীর সহিত কাশ্মীরে প্রত্যাগমন করিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মহাস্থানে হিন্দু প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহাস্থান মুসলমানগণের দ্বারা বিজিত হয়। প্রবাদ, শাহ সুলতান হজরত আউলিয়া নামক বাল্ক প্রদেশ (প্রাচীন বাহলীক) বাসী জনৈক মুসলমান সাধু মহাস্থানের রাজা পরশুরামকে যুদ্ধে নিহত করিয়া এই স্থান অধিকার করেন। কথিত আছে, শাহ সুলতান একটি বিরাট মৎস্যের উপর আরোহণ করিয়া করতোয়া নদী দিয়া যাতায়াত করিতেন; তজ্জন্য লোকে তাঁহার উপাধি দিয়াছিল "মাহী-সওয়ার" বা মৎস্যারোহী। রাজা পরশুরামও তন্ত্রসিদ্ধ ও অদ্ভুত ক্ষমতাশালী ছিলেন। জীয়ৎকুণ্ড নামক কূপের মন্ত্রপূত জলের দ্বারা তিনি মৃত সৈন্যগণকে পুনর্জ্জীবন দান করিতেন। এই জন্য প্রথম দিকে পীর শাহ সুলতান যুদ্ধে বিজয় লাভ করিতে পারেন নাই। পরে অদ্ভুত ক্ষমতা বলে তিনি স্বয়ং একটি বাজপক্ষীর আকার ধারণ করিয়া শূন্যদেশ হইতে এক খণ্ড গোমাংস নিক্ষেপের দ্বারা জীয়ৎকুণ্ডের জল অপবিত্র করিয়া দিলে উহার মৃত সঞ্জীবনী শক্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং পরবর্ত্তী যুদ্ধে রাজা পরশু-রামের সৈন্যক্ষয় হইতে থাকে ও অবশেষে তিনি স্বয়ং পরাস্ত ও নিহত হন। তাঁহার সুন্দরী ও যুবতী কন্যা শীলাদেবী কঙ্কণাঘাতে পীর শাহ সুলতানকে নিহত করিয়া করতোয়া নদীর জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন। প্রবাদ অনুসারে যে ঘাটে তিনি ডুবিয়া মরেন উহা আজিও শীলাদেবীর ঘাট নামে পরিচিত। শীলাদেবীর আত্মবিসর্জ্জনের করুণ কাহিনী অবলম্বন করিয়া এইচ্, এস্, টেলর নামক জনৈক য়ুরোপীয় পর্য্যটক "Lay of Mahasthangarh" নামে একটি সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছেন। শীলাদেবীর কাহিনীটিকে অনেকে সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন, অতি প্রাচীনকাল হইতে মহাস্থানে শিলাদ্বীপ নামক যে তীর্থ আছে উহাই পরবর্ত্তী কালে শিলাদ্বীপের ঘাট বা শীলাদেবীর ঘাট নামে পরিচিত হইয়াছে। মহাস্থানের ভগ্নাবশেষ উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৪৫০০ ফুট ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৩০০০ ফুট; ভূমি হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় ১৫ ফুট।

মহাস্থানের দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে প্রাচীন দুর্গ সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। ইহার পূর্ব্ব দিকের প্রাকার এখনও অনেকস্থলে অভগ্ন অবস্থায় আছে। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে ইষ্টকের সোপান শ্রেণী পার হইয়া মহাস্থানগড় বিজয়ী পীর শাহ সুলতানের সমাধি বা দরগাহ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দরগাহের নিম্নভাগ প্রস্তর নির্ম্মিত ও উর্দ্ধভাগ ইষ্টকের দ্বারা প্রস্তুত। অনেকে অনুমান করেন যে একটি বৌদ্ধ বা হিন্দুমন্দির ভাঙ্গিয়া ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার প্রস্তর নির্ম্মিত চৌকাঠে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত বঙ্গাক্ষরে "শ্রীনরসিংহদাসস্য" কথা কয়টি লেখা আছে। নরসিংহ দাস কে ছিলেন তাহা জানা যায় নাই। অনেকে অনুমান করেন যে শিল্পীর নামই নরসিংহ

দাস। দরগাহের নিকটে ইষ্টক নির্ম্মিত একটি ছোট মসজিদ ও একটি মক্তব আছে। মসজিদটি মুঘল বাদশাহ ফরু-রুখ-শিয়রের রাজত্বকালে ১৭১২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। দরগাহের অঙ্গনে অনেকগুলি কবর আছে, ইহার মধ্যে কতকগুলি কবর শাহ সুলতানের অনুচরগণের এবং অপর কতকগুলি দরগাহের খাদেমগণের সমাধি। দরগাহের প্রবেশ দ্বারের নিকট বৃহৎ গৌরীপাট এবং পুরোহিতের প্রস্তরাসন দৃষ্ট হয়। দরগাহের পশ্চাৎ দিকে অবস্থিত একটি বড় কূপকে স্থানীয় লোকে রাজা পরশুরামের জীয়ৎকুণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করে। প্রাচীন দুর্গের প্রাকার ইষ্টক নির্ম্মিত ও মৃত্তিকা আচ্ছাদিত। ইহার পূর্ব্ব দিকে করতোয়া নদী ও অপর তিনদিকে বিস্তৃত পরিখার চিহ্ন দেখা যায়। দক্ষিণ দিকের পরিখা বারাণসী খাল, পশ্চিমের পরিখা গিলাতলা খাল ও উত্তর দিকের পরিখা কালীদহ সাগর নামে পরিচিত। কালীদহ সাগর মহাস্থানের উত্তরে অবস্থিত একটি বিল বিশেষ। বর্ত্তমানে দুর্গের পূর্ব্ব দিকে দোরাব সাহের দরজা ও শীলাদেবীর ঘাটের দরজা নামে দুইটি, উত্তর দিকে ঘাঘোর দুয়ার নামে একটি ও পশ্চিম দিকে তাম্র দরজা ও আর একটি ফটকের চিহ্ন আছে। উত্তর দিকের দরজা হইতে সনাতন সাহেবের গলি নামক একটি রাস্তা গড়ের ভিতর দিয়া গোবিন্দের দ্বীপ পর্য্যন্ত গিয়াছে। দুর্গের অভ্যন্তরে শাহ সুলতানের দরগাহের নিকটে "খোদার পাথর" ও "মানকালীর কুণ্ড" নামক দুইটি ধ্বংস স্তূপ আছে। এই স্থানে পূর্ব্বে দুইটি মন্দির ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার চতুর্দ্দিকে ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ড প্রভৃতি নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। খোদার পাথর নামক প্রস্তর খণ্ডটির দৈর্ঘ্য ১১ ফুট ও বেড় প্রায় ৩ ফুট ; ইহা কোন দেব মন্দিরের চৌকাঠ ছিল বলিয়া মনে হয়। খোদার পাথরের চারিদিকে খনন করিয়া প্রাচীন মন্দিরের পাথরের মেঝে ও কয়েকটি প্রস্তর খণ্ড পাওয়া গিয়াছে ; একটি প্রস্তরখণ্ডে চারিটি ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি ও একটি ভক্তের মূর্ত্তি খোদিত আছে। ইহা রাজশাহীতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। ইহা একটি বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। উত্তর দিকস্থ পথ সনাতন সাহেবের গলি দিয়া অগ্রসর হইলে বৈরাগীর ভিটা ও গোবিন্দের ভিটা প্রভৃতি ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্ত্তৃক খননের ফলে এই সকল স্থানেও মৃত্তিকামধ্যে প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তি ও কয়েকটি কক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কক্ষ সংলগ্ন ইষ্টকে পাহাড়পুর স্তূপের ন্যায় বহু দেবদেবী, জীবজন্তু ও পুষ্পলতাদির চিত্র উৎকীর্ণ আছে।

গোবিন্দের ভিটা নামক স্তূপটির প্রাচীন নাম গোবিন্দ দ্বীপ ; ইহা করতোয়া নদীর ঠিক উপরেই অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহার চারিদিকে করতোয়া বহিত। এখনও একটি প্রাচীন ঘাটের চিহ্ন রহিয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিক গণের মতে এই স্থানেই প্রাচীন মহাস্থানের সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ বা বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার পার্শ্ব দিয়া একটি ক্ষুদ্র খাল করতোয়া নদীতে গিয়া পড়িয়াছে। এই খালটি কালীদহ সাগর হইতে উঠিয়া আসিয়াছে। গোবিন্দের ভিটার সংলগ্ন ঘাট বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। আজিও প্রতিবৎসর বারুণী ও পৌষসংক্রান্তির দিনে উত্তরবঙ্গের বহু স্থান হইতে আগত যাত্রিগণ মহাস্থানের শীলাদেবীর ঘাট ও গোবিন্দদ্বীপের ঘাটে করতোয়ায় স্নান করিয়া থাকেন। পৌষ সংক্রান্তির সহিত "নারায়ণী যোগ" সংঘটিত হইলে ভারতের নানাস্থান হইতে আগত যাত্রীর সংখ্যা প্রায় লক্ষ পর্য্যন্ত হয়। সাধারণতঃ প্রতি ১২ বৎসর অন্তর একবার "পৌষ নারায়ণী যোগ" হইয়া থাকে।

মহাস্থান দুর্গের পশ্চিমভাগে তাম্রদরজা হইতে দুর্গের বাহিরে রাজা পরশুরামের প্রাসাদ ও সভাবাটী অবস্থিত। এই স্থানেও খননের দ্বারা গৃহভিত্তি, প্রাচীর ও কক্ষাদি আবিষ্কৃত

হইয়াছে। এই স্থান হইতে একটি রাস্তা পশ্চিমদিকে মথুরা ও ভাসুবিহার প্রভৃতি গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছে। সুবিখ্যাত "রামচরিত" কাব্য-রচয়িতা কবি সন্ধ্যাকর নন্দী মহাস্থানের অধিবাসী ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পালরাজবংশের কর্ম্মচারী নন্দীদিগের একখানি প্রাচীন শিলালেখের ভগ্নাংশ মহাস্থানের নিকটে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহাতে দশম বা একাদশ খৃষ্টাব্দের লেখা দৃষ্ট হয়। মহাস্থানের নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে গুপ্তযুগের বলিয়া কথিত কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল।

মহাস্থান হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে বিহার নামে গ্রামে ও পার্শ্বেই ভাসোয়া বিহার বা ভাসুবিহার গ্রামে পুরাতন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। সপ্তম শতাব্দীতে য়ুয়ান্ চোয়াং যখন পুণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমন করেন, তখন এই স্থানে তিনি একটি গগনস্পর্শী চূড়াসমন্বিত বৌদ্ধবিহার দেখিয়াছিলেন। তিনি ইহাকে পো-শি-পো বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সঙ্ঘারামে মহাযান সম্প্রদায়ের ৭০০ ভিক্ষু ও বহু বিখ্যাত শ্রমণ অবস্থান করিতেন। সঙ্ঘারামের নিকটে মহারাজ অশোক নির্ম্মিত একটি স্তূপ তিনি দেখিয়াছিলেন; স্তূপের স্থানটিতে পূর্ব্বকালে ভগবান তথাগত তিন মাস ধরিয়া ধর্ম্ম ব্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ইহার অনতিদূরে অবলোকিতেশ্বরের মন্দিরে দূর-দূরান্তর হইতে যাত্রী আসিয়া প্রার্থনা করিত। কানিংহাম সাহেব ভাসুবিহার গ্রামের ৭০০ ফুট দীর্ঘে ও ৬০০ ফুট প্রস্থে ভগ্নাবশেষটি য়ুয়ান্ চোয়াং বর্ণিত সঙ্ঘারাম বলিয়া নির্ণয় করেন এবং ইষ্টক-নির্ম্মিত এখনও প্রায় ৩০ ফুট উচ্চ স্তূপটিকে অশোক নির্ম্মিত স্তূপ এবং ইহার উত্তরে মন্দিরের ভগ্নাবশেষকে অবলোকিতেশ্বরের মন্দির বলিয়া অনুমান করেন। তৎকালে ভাসুবিহার বৌদ্ধ সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং এই স্থানের খ্যাতি সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ভাসোয়া বিহার গ্রামে "সুসঙ্গ দীঘি" নামে একটি প্রাচীন দীর্ঘিকা আছে। প্রবাদ, ইহা সুসঙ্গ নামক রাজার দ্বারা খনিত। এই সুসঙ্গ রাজা কে ছিলেন তাহা জানা যায় নাই। মহারাজ বল্লাল সেনের গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট বিহার গ্রামবাসী ছিলেন। তাঁহার হারলতা নামক স্মৃতি সংগ্রহ এখনও প্রচলিত আছে

মহাস্থানের অতি নিকটে দক্ষিণ দিকে গোকুল নামক গ্রাম অবস্থিত। এখানেও একটি প্রকাণ্ড ধ্বংস স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা "গোকুলের মেঢ়" নামে পরিচিত। এই স্তূপটি চতুর্ব্বিংশতি কোণ বিশিষ্ট ও মৃত্তিকা হইতে ইহার ভিত্তির উচ্চতা প্রায় এক ফুট। এই স্থান খনন করিয়া প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ প্রায় ১৭০টি কক্ষ আবিষ্কার করিয়াছেন। পরস্পরের গাত্র-সংলগ্ন এই কক্ষগুলিকে মৌমাছির চাকের খোপের মত দেখায়। স্তূপের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে ৪½ ফুট বিস্তৃত ও প্রায় ২৫ ফুট উচ্চ সোপান শ্রেণী বাহির হইয়াছে। এই স্তূপটিও একটি বৌদ্ধ দেবায়তন ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার প্রাচীর গাত্রে টালির উপর মানুষ, জীবজন্তু, লতাপাতা প্রভৃতির চিত্র উৎকীর্ণ আছে। ইহার শিল্প পদ্ধতি দেখিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন যে আনুমানিক ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শতাব্দীতে গুপ্তযুগে এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই গ্রামে এখনও বহু সংখ্যক গোপের বাস আছে। নেতা ধোপানীর পাট নামে একটি স্তূপও এখানে দৃষ্ট হয়।

মহাস্থান হইতে প্রায় ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত চাঁদনীয়া বা চাঁদমুয়া একটি পুরাতন স্থান। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বেও এই স্থান উত্তর-বঙ্গের একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। অনেকে অনুমান করেন যে এই স্থানের প্রাচীন নাম চম্পানগর এবং মনসার ভাসান গানের নায়ক চাঁদ সদাগর

এখানেই বাস করিতেন। এই গ্রামের দুইদিকে গৌরী ও সোনারাই নামে দুইটি নদীর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সোনারাই নদীর মধ্যে একটি উচু ঢিবি ও কিনারা হইতে তথায় যাইবার জন্য একটি সেতুর ভগ্নাবশেষ আছে। অনেকে বলেন যে নদীর মধ্যে পদ্মা বা মনসা দেবীর একটি মন্দির ছিল। চাঁদনীয়া গ্রামের দক্ষিণে কালীদহ সাগর নামক বিল অবস্থিত।

চাঁদনীয়ার পার্শ্বেই করতোয়া কূলে শিবগঞ্জ মুসলমান যুগে একটি সামরিক ঘাঁটি ছিল। ইহা একটি বন্দর। শিবগঞ্জ থানার অন্তগত ইহার নিকটেই করতোয়া কূলে কীচক একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। প্রবাদ মহাভারতের কীচক এই স্থানে বাস করিতেন। ইহার ৬ মাইল উত্তরে রংপুর জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার অন্তর্গত বিরাট নামক স্থানে বিরাট রাজার বাড়ী ছিল বলিয়া কথিত।

মহাস্থান হইতে প্রায় ২০ মাইল উত্তরে শালদহ নামক একটি প্রাচীন স্থান আছে। এই গ্রামেও বহু উচু ঢিবি, প্রাচীন ইষ্টক, দগ্ধ মৃত্তিকা আচ্ছাদিত প্রান্তর ও কয়েকটি লুপ্তপ্রায় প্রাচীন দীঘি দৃষ্ট হয়। অনেকে অনুমান করেন যে ক্ষৌণীনায়ক ভীম এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন।

মহাস্থানের নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলির গোকুল, বৃন্দাবন পাড়া ও মথুরা প্রভৃতি নাম ভ্রমণকারী মাত্রেরই বিস্ময় উৎপাদন করে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী পুণ্ড্ররাজ বাসুদেবের সময় হইতেই যে এই স্থানগুলির এইরূপ নামকরণ হইয়াছে, এইরূপ অনুমান যদি কেহ করেন, তবে তাহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে বলিয়াই মনে হয়।

মহাস্থানের নিকট করতোয়া তীরে আরোড়া গ্রামে "রসকদম্ব" রচয়িতা কবি বল্লভের জন্মস্থান। তাঁহার গ্রন্থ ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। ইহাতে আদি, সুত্র, বৈভব, হাস্য, প্রেম প্রভৃতি রসের অবলম্বনে ২২টি অধ্যায় আছে এবং বৈষ্ণবতত্ব অবলম্বনে ইহা রচিত।

শেরপুর—বগুড়া হইতে শেরপুর দক্ষিণে ১০ মাইল দূর। বগুড়া ও শেরপুরের মধ্যে মোটরবাস যাতায়াত করে। শেরপুর বগুড়া জেলার দ্বিতীয় শহর এবং একটি প্রসিদ্ধ পুরাতন স্থান। মুঘল যুগে এই স্থানে একটি প্রত্যন্ত দুর্গ ছিল এবং এই স্থানের নাম ছিল শেরপুর মুরচা। প্রাচীন দুর্গের চিহ্ন এখনও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। আকবর-নামা ও আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ আছে। বাংলার ভূস্বামিগণের বিদ্রোহ দমন করিতে আসিয়া মুঘল সেনাপতি মহারাজা মানসিংহ কিছুকাল শেরপুরে বাস করিয়াছিলেন এবং এই স্থানে একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। উহার ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। শেরপুরে খানরা মসজিদ ও বন্দেগী সদর জাহান মসজিদ নামে দুইটি পুরাতন মসজিদ দেখিতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত মসজিদ্‌টি ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে নবাব মির্জ্জা মুরাদ খাঁ কর্তৃক নির্ম্মিত। শেরপুর শহরের বাহিরে জীর্ণ খেরুয়া মসজিদের শিলালেখটি সুন্দর। শেরপুর শহরে তুরকান্‌ শহিদের শিরে-মোকাম ও শহরের বাহিরে ধড় মোকাম নামে দুইটি দরগাহ বর্ত্তমান। প্রবাদ রাজা বল্লাল সেনের সহিত যুদ্ধে পীর তুরকান্‌ সাহেব নিহত হন। যে স্থানদ্বয়ে তাঁহার শির ও ধড় পড়িয়াছিল তথায় দুটি দরগাহ স্থাপিত হয়। গাজি মিঞা, হটিলা প্রভৃতি আরও কয়েকটি পীরের আস্তানা এখানে আছে। প্রতি বৎসর জৈষ্ঠ মাসের দ্বিতীয় রবিবারে গাজি মিঞার বিবাহোৎসব ধুম ধামের সহিত সম্পন্ন হয়।

শেরপুর নাটোর রাজবংশের সম্পত্তি। নাটোরের বারদুয়ারী কাছারি, নাটোর রাজবংশ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হরগৌরী ও অনাদিলিঙ্গ শিবের মন্দির এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য। শেরপুর একটি বিখ্যাত বাণিজ্যের স্থান। এখানকার কর্পদুল নামে বহুমূল্য রেশমী মশারি প্রসিদ্ধ ছিল।

শেরপুরের চার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রাজবাড়ী মুকুন্দ নামক স্থানে একটি রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ, এই স্থানে বল্লাল সেনের একটি বাড়ী ছিল। কিংবদন্তী অনুসারে বল্লাল সেন বৃদ্ধকালে একটি তথাকথিত নীচ জাতীয়া যুবতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন এবং তজ্জন্য তাঁহার পুত্র যুবরাজ লক্ষ্মণ সেনের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হইলে তিনি রাজ্য ছাড়িয়া এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। এখানে চণ্ডীপুকুর, কাঞ্জী পুকুর প্রভৃতি নামে অভিহিত কয়েকটি প্রাচীন পুষ্করিণী আছে। পরে এই স্থানে মুকুন্দ নামে কোনও রাজা ছিলেন বলিয়া কথিত। ভগ্নাবশেষ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ইহা একটি নগরী বিশেষ ছিল।

শেরপুর হইতে প্রায় দক্ষিণে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত ভবানীপুর একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। শেরপর হইতে রাণীর জাঙ্গাল নামে একটি সুউচ্চ পথ ভবানীপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। সাঁতৈলের রাণী সত্যবতী ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাত। শেরপুর একপঞ্চাশৎ শক্তি মহাপীঠের অন্যতম বলিয়া খ্যাত। এই স্থানের পূর্ব্বনাম ছিল ভাবতা এবং ইহার পার্শ্ব দিয়া করতোয়া নদী প্রবাহিত ছিল। এখন করতোয়া এই স্থান হইতে প্রায় চার মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। শাস্ত্র অনুসারে করতোয়া তীরে সতীর তল্প পড়িয়াছিল, দেবীর নাম অপর্ণা, ভৈরব বামন। কথিত আছে, পূর্ব্বে এই মহাপীঠ অরণ্যমধ্যে গুপ্ত অবস্থায় ছিল। মনোহর নামক একজন উদাসীন এই মহাপীঠের আবিষ্কার করেন। ইহার আবিষ্কার সম্বন্ধে ও শাঁখারীর নিকট হইতে বালিকা বেশে দেবীর শাঁখা লওয়া ও পুষ্করিণী হইতে শাঁখা পরিহিত হস্ত উত্তোলন করা এবং কপিলা গাভীর দুগ্ধ দানের কাহিনী প্রচলিত আছে। মনোহর করতোয়া তীরে এক পর্ণ কুটিরের মধ্যে দেবী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, জনৈক মুঘল রাজপুরুষ এই দেবীর নিকট মানত করিবার ফলে রাজরোষ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া দেবীর জন্য একটি সুন্দর যুগ্ম মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। পরে সাঁতৈলের রাজা রামকৃষ্ণ একটি পশ্চিমদ্বারী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে দেবী মূর্ত্তিকে স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু দেবী স্বপ্নে আদেশ করেন যে মুঘল রাজপুরুষ নির্ম্মিত মন্দিরে থাকিতেই তাঁহার ইচ্ছা। সুতরাং নূতন মন্দির হইতে দেবীপ্রতিমা পুনরায় আদি মন্দিরে স্থানান্তরিত হইলেন। শাস্ত্র অনুসারে এই দেবীর নাম অপর্ণা হইলেও সাধারণের নিকট ইনি ভবানী নামে সুপরিচিতা এবং দেবীর নাম হইতে প্রাচীন ভাবতার নব নাম ভবানীপুর হয়। ভবানীপুর নাটোর রাজবংশের সম্পত্তি। নাটোরের রাণী ভবানী দেবীমন্দিরের পার্শ্বে একটি বারদ্বারী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ভবানীশ্বর নামে এক শিবপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার দত্তক পুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণ একজন উচ্চাঙ্গের সাধক ছিলেন। তিনি এখানে এক পঞ্চমুণ্ডী আসন নির্ম্মাণ করিয়া যোগ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। রাজা রামকৃষ্ণের পঞ্চমুণ্ডী আসন আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে পাঠাধোয়া নামে একটি প্রকাণ্ড দীঘি ও একটি জলটুঙ্গির ভগ্নাবশেষ আছে। ভবানী দেবীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উত্তরবঙ্গে বহু অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত আছে। এখানে প্রত্যহ বহু মণ চাউলের অন্নভোগ হয় এবং সমাগত অতিথি অভ্যাগতগণকে অন্ন প্রসাদ প্রদান করা হয়। দেবীর আদেশ অনুসারে দেবীর ভোগে প্রত্যহ বোয়াল মাছ দেওয়া হয়। এখানে শ্যামা পূজা ও
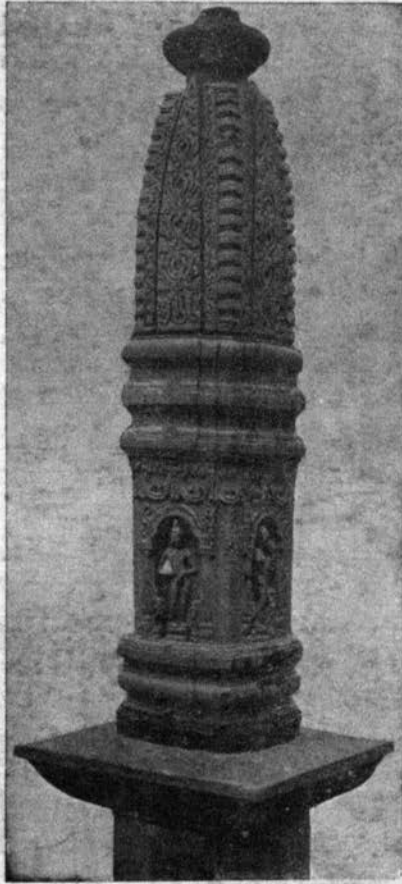
বাণগড় হইতে আনীত প্রস্তরস্তম্ভ, দিনাজপুর (পৃষ্ঠা ১)
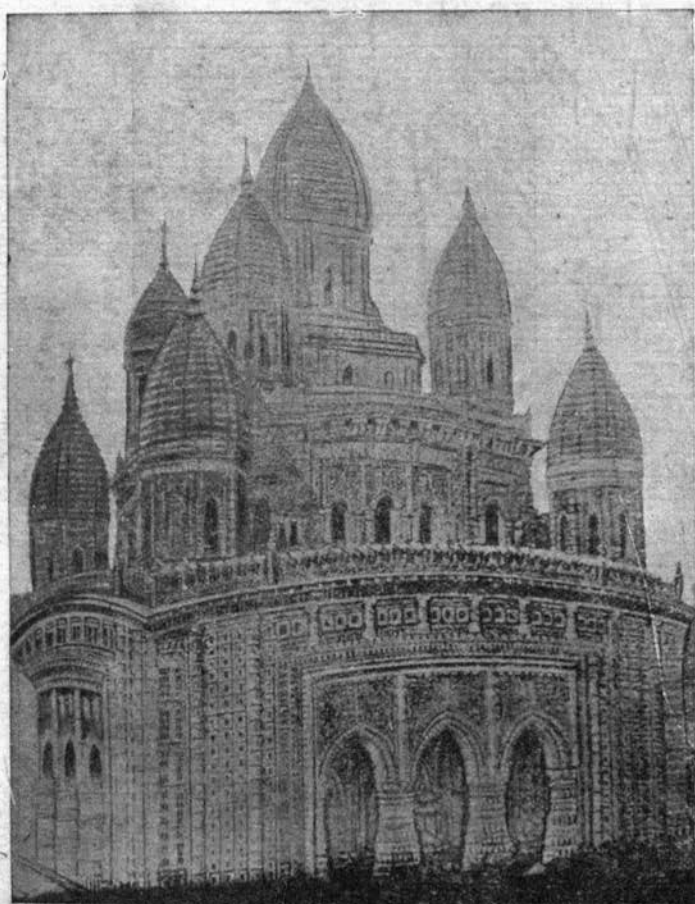
কান্তনগরের পুরাতন মন্দির (পৃষ্ঠা ২)
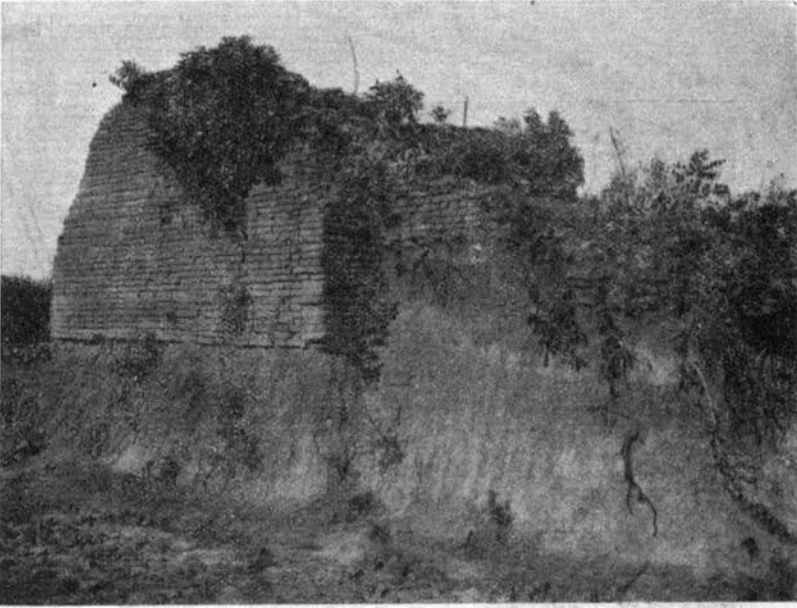
যোগীর ভবন, বগুড়া (পৃষ্ঠা ১০)

সাগরদীঘি, কোচবিহার (পৃষ্ঠা ২৬)
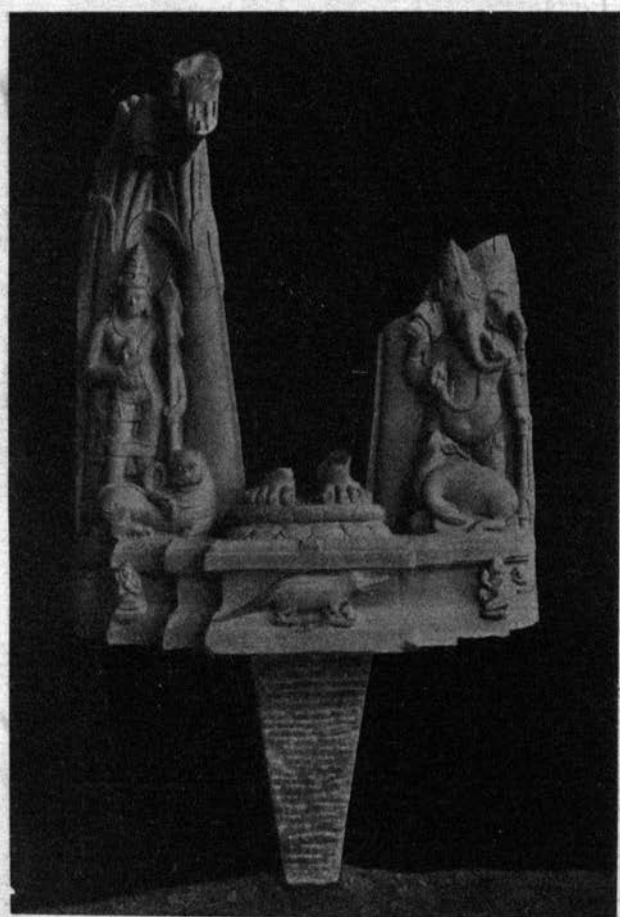
মহাস্থানগড়ে আবিষ্কৃত চণ্ডীমূর্ত্তি (পৃষ্ঠা ১০)

রাম নবমী উপলক্ষে বহু লোকের সমাগম হয়। তাহা ছাড়া বৈশাখ মাসের প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে ছোটখাট মেলা হইয়া থাকে। শেরপুর হইতে এই স্থানে ঘোড়ার গাড়ীতে অথবা পদব্রজে যাইতে হয়।

শেরপুর হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে কাশীপাড়া গ্রামে একটি অষ্টভুজা কঙ্কালসার চামুণ্ডা মুর্ত্তি দৃষ্ট হয়। শায়িত ভৈরবের উপর দেবী পদ্মাসনে উপবিষ্টা। শেরপুর হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে ক্ষিদ্রলল্লী গ্রামে একটি চতুর্ভুজা মনসা, একটি স্থর্য্যমূর্ত্তি ও বৌদ্ধ স্ত্রীমূর্ত্তি আছে। শেরপুরের নিকটস্থ জঙ্গলে চিতা বাঘ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়।

সোনাতলা—কলিকাতা হইতে ২১৬ মাইল। ইহা একটি বড় গঞ্জ। স্টেশনের পূর্ব্বদিকে নিকটেই গড় ফতেপুর নামক একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহা কামতাপুর রাজ নীলাম্বরের দুর্গ ছিল বলিয়া কথিত। গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ কর্ত্তৃক ইনি পরাজিত হইলে সম্ভবতঃ গড় ফতেপুর মুসলমান গণের অধিকারে আসে। দিনহাটা স্টেশন দ্রষ্টব্য।

মহিমাগঞ্জ—কলিকাতা হইতে কিঞ্চিদধিক ২২০ মাইল। স্টেশন ছাড়াইয়াই বাঙ্গালী নদীর উপর রেলের পুল আছে। স্টেশন হইতে নদী পর্য্যন্ত একটি ঘাট সাইডিং আছে। বাঙ্গালী নদীর উপরিভাগ আলাই ও তাহার উপর ঘাঘট নামে পরিচিত; ঘাঘট এককালে তিস্তার একটি প্রধান শাখা ছিল।

স্টেশন হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে বর্দ্ধনকোট একটি পুরাতন স্থান; এখানে একঘর জমিদারের বাস আছে। গ্রামের নিকটে সর্ব্বমঙ্গলা ও শ্যামসুন্দর নামে দুইটি ভগ্নপ্রায় মন্দির ও কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। মন্দির দুটির শিলালেখ হইতে জানা যায় যে ১৬০১ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান জমিদার বংশের পূর্ব্বপুরুষ রাজা ভগবান্ কর্ত্তৃক এই মন্দির দুইটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্দ্ধনকোট হইতে আড়াই মাইল পশ্চিমে গোবিন্দগঞ্জ থানা এবং তথা হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে বিরাট নামক গ্রামে প্রতি বৎসর একমাস ব্যাপী মেলা বসিয়া থাকে; বিহার হইতে আনীত গবাদি পশু মেলায় বিক্রীত হয়। বগুড়া প্রসঙ্গে বিরাটের কথা বলা হইয়াছে।

বোনারপাড়া জংশন—কলিকাতা হইতে ২২৫ মাইল দূর। এই স্থান হইতে একটি শাখা লাইন ১১ মাইল দূরবর্ত্তী তিস্তামুখ ঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখা পথে বোনারপাড়া হইতে ৮ মাইল দূরবর্ত্তী তিস্তামুখ ঘাটের আগের স্টেশন ফুলছড়ি একটি উল্লেখযোগ্য স্টেশন। ইহা ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। কলিকাতা হইতে যে সকল মাল বাহী স্টীমার আসামে যায় তাহার অধিকাংশই ফুলছড়িতে ধরে। ফুলছড়ি হইতে ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বতীরে অবস্থিত বাহাদুরাবাদ পর্য্যন্ত খেয়া জাহাজে করিয়া মালগাড়ী ও তিস্তামুখ ঘাট হইতে যাত্রী পারাপার করা হয়। ফুলছড়ি একটি স্বাস্থ্যকর স্থান।

গাইবান্ধা—কলিকাতা হইতে ২৩৭ মাইল দূর। ইহা রংপুর জেলার একটি মহকুমা ও পাটের ব্যবসায়ের বড় কেন্দ্র। শহরটি ঘাঘট নদীর তীরে অবস্থিত। ইহার প্রায় সকল দিকেই জলাভূমি দৃষ্ট হয়। গাইবান্ধা হইতে ৮ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রের নিকটে মনাস নদীর উপর কামারজানি একটি বড় গঞ্জ ও বন্দর।

কাউনিয়া জংশন—সান্তাহার জংশন ও পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে যথাক্রমে ৯৬ ও ৩৪ মাইল দূর। প্রধান লাইনের পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে একটি মাঝারি মাপের শাখা লাইন আসিয়া এই স্থানে মিশিয়াছে। এই শাখাপথে বদরগঞ্জ, শ্যামপুর, রংপুর ও ভূতছাড়া উল্লেখযোগ্য স্টেশন। কাউনিয়ার উত্তরে তিস্তা নদী প্রবাহিত।

বদরগঞ্জ—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ১০ মাইল দূর। এই স্থান হইতে ৮ মাইল দূরে ক্ষৌণী-নায়ক ভীমের স্মৃতি বিজড়িত "ভীমের গড়" নামক দুর্গ প্রাকারের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। নিকটবর্ত্তী রস্তমাবাদ নামক গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ "ভীমের জাঙ্গালের" কিয়দংশ দেখিতে পাওয়া যায়। বদরগঞ্জ একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান। প্রতি বৎসর শীতকালে প্রায় একমাস ব্যাপী মেলা এখানে বসিয়া থাকে।

শ্যামপুর—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ১৬ মাইল দূর। ইহার নিকটবর্ত্তী সদ্যপুষ্করিণী একটি পুরাতন গ্রাম। এখানে বহু প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংশাবশেষ দৃষ্ট হয়। গ্রামটিতে কয়েক ঘর জমিদারের বাস। শ্যামপুর স্টেশনের নিকটবর্ত্তী বাগ্‌দুয়ার গ্রামে একটি বৌদ্ধমূর্ত্তির ভগ্নাংশ বাগদেবী নামে পূজিতা হইয়া থাকে।

রংপুর—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ২৪ ও কলিকাতা হইতে ২৫৭ মাইল দূর। জেলার সদর শহর রংপুর ঘাঘট নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। প্রাচীন কালে এই স্থান কামরূপ রাজ্যের ও পরে কোচরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রবাদ, এই স্থানে কামরূপরাজ ভগদত্তের প্রমোদ স্থান ছিল বলিয়াই ইহার রঙ্গপুর নাম হয়। রংপুর শহরের নিকটে পায়রাবাঁধ নামে একটি পরগণা আছে, উহা রাজা ভগদত্তের কন্যা পায়রামতীর সম্পত্তি ছিল বলিয়া কিংবদন্তী আছে। আবার কেহ কেহ বলেন, যে আসাম প্রদেশের অন্তর্গত শিবসাগরের দক্ষিণে রঙ্গপুর নামে যে স্থান আছে উহাই কামরূপ-রাজ ভগদত্তের প্রমোদ-নগরী ছিল। মুসলমান আমলে রংপুর প্রত্যন্তপ্রদেশ বা মুসলমান অধিকৃত বাংলার সীমান্তে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ঘোড়াঘাট শহর বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিলে তথাকার ফৌজদার রংপুরে উঠিয়া আসেন। মুসলমান যুগে রংপুর ফৌজদারি ফকিরকুণ্ডি নামে খ্যাতি লাভ করে।

ইংরেজ অধিকারের প্রথম আমলে রংপুর জেলা বহুদিন ধরিয়া অশান্তি ও উপদ্রবের কেন্দ্র ছিল। শাসন কার্য্যের বিশৃঙখলার জন্য এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ইজারাদার দেবীসিংহের অত্যাচারের ফলে ("নশীপুর রোড" দ্রষ্টব্য) অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে উত্তর-বঙ্গের প্রজাসাধারণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং ভবানী পাঠক ও মজনু শা নামক দুইজন দলপতির নেতৃত্বে তাহারা নানাস্থানে লুটপাট চালাইতে থাকে। এই দলে প্রায় ৫০,০০০ লোক ছিল। প্রথমতঃ রংপুরের কলেক্টরের প্রেরিত বরকন্দাজ সৈন্য তাহাদিগকে দমন করিতে সমর্থ হয় না। পরে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে লেপ্টেন্যান্ট ব্রেনানের নেতৃত্বে ইহাদের বিরুদ্ধে একটি সেনাবাহিনী প্রেরিত হয়। লেঃ ব্রেনান জনৈক দেশীয় ব্যক্তির সাহায্যে ভবানী পাঠকের বজরা আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে তাহাকে নিহত করেন। লেঃ ব্রেনানের রিপোর্ট হইতে "দেবী চৌধুরাণী" নাম্নী জনৈকা দস্যু নেত্রীর কাহিনীও অবগত হওয়া যায়। ইনি নৌকায় বাস করিতেন; ইহার অধীনে বহু সৈন্য সামন্ত ছিল এবং ভবানী পাঠকও তাঁহার দলভুক্ত ছিলেন। এই কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র "দেবী চৌধুরাণী" নামক যে অমর উপন্যাস রচনা করিয়াছেন তাহা শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই পরিচিত। "জলপাইগুড়ি"

দ্রষ্টব্য। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৭০০ সন্ন্যাসী ও ফকির একটি দলগঠন করিয়া এই জেলার নানা স্থানে অত্যাচার করিতে অরম্ভ করে। ইহাদের বহু ঘোড়া, হাতী, উট ও নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র ছিল। ১৮০ জন সিপাহীকে লইয়া লেঃ ম্যাক্‌ডোনালড নামক জনৈক সেনা-নায়ক এই দলটিকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন। কিন্তু তিন বৎসর পরে এই দলের নেতৃগণ প্রায় দেড় হাজার লোক ও গাদা বন্দুক প্রভৃতি লইয়া পুনরায় দৌরাত্ম্য সুরু করে। ইহাদিগকে দমন করিতে বাংলা সরকারকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত রংপুর জেলায় এইরূপ উপদ্রব প্রবল ছিল।

রংপুর শহরটি মাহিগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, ধাপ ও লালবাগ এই চারি অংশে বিভক্ত। মাহিগঞ্জেই নবাবী আমলে ফৌজদারি কাছারি ছিল। এই স্থানে শাহ জালাল বোখারি ও সৈয়দ গোরা নামক দুইজন পীরের দুইটি পুরাতন মসজিদ আছে। প্রবাদ, শাহ জালাল বোখারি একটি মৎস্যের পৃষ্ঠে চড়িয়া এই স্থানে আসিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম হয় মাহিগঞ্জ। এখানে প্রায় ১২৫ বৎসরের পুরাতন একটি জগন্নাথ-মন্দির আছে। দেওয়ান রঙ্গলাল নামক রংপর কলেক্টরির জনৈক দেওয়ান ইহার প্রতিষ্ঠাতা। রংপুর শহরের নবাবগঞ্জ পল্লীর মুন্সীপাড়া নামক স্থানে মৌলানা কেরামত আলি নামক জনৈক সাধু ব্যক্তির কবর আছে। ইনি প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। বহু দূর হইতে লোকে ইহার সমাধি দেখিতে আসে। রংপুরের লালবাগ পল্লী রেল স্টেশনের নিকটে অবস্থিত। স্টেশনের নিকটে উত্তরবঙ্গের অন্যতম বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "কারমাইকেল কলেজ" নামক প্রথম শ্রেণীর কলেজের প্রাসাদোপম ভবন অবস্থিত। রংপুর জেলায় বহু জমিদারের বাস; সেই জন্য রংপুর শহরে তাজহাট, ডিমলা, কাকিনা, মন্থনা, পীরগঞ্জ, বর্দ্ধনকোট প্রভৃতি স্থানের প্রসিদ্ধ জমিদারগণের সুন্দর সুন্দর বাড়ী আছে। এখানকার জেলাবোর্ডের বাড়ীটিও অতি সুন্দর। প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন জৈন মন্দির, শিখদিগের দুইটি পুরাতন "সঙ্গত" বা ভজনাগার ও উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য পরিষৎ ভবনও রংপুরের দ্রষ্টব্য বস্তু। উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য পরিষদে উত্তর-বঙ্গের অনেক পুরাতত্ত্ব সম্পর্কিত দ্রব্যাদি সযত্নে রক্ষিত আছে। তাজহাট জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা মান্নালাল রায় শিখ ধর্ম্মাবলম্বী পাঞ্জাবী ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রংপুর শহরের মাহিগঞ্জে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। ক্রমে তিনি বৃহৎ জমিদারীর মালিক হন। তাঁহার তাজ বা শিরস্ত্রাণ হইতে তাঁহার বাসস্থান তাজহাট নামে পরিচিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায় রংপুর কলেক্টরিতে কিছুকাল কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার বাসাবাটির একটি ইন্দারা এখনও এখানে বর্ত্তমান আছে। দুর্গা পূজার সময়ে এখানে রামের রথ বাহির হয় এবং একটি মেলা বসিয়া থাকে। রামের রথ বাংলার আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

শীতকালের দিনে আকাশ পরিষ্কার থাকিলে রংপুর শহর হইতে হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত শিখর দেখিতে পাওয়া যায়।

রংপুর জেলা তামাকের চাষের জন্য বিখ্যাত। ভারতের বাহিরেও এই স্থানের তামাকের চাহিদা আছে।

রংপুরের ১০ মাইল উত্তরে অবস্থিত মহীপুর একটি পুরাতন মুসলমান জমিদার বংশের বাসস্থান। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে কোচবিহার রাজ্যের সেনাপতি আরিফ মহম্মদ চৌধুরী এই জমিদারীর সৃষ্টি করেন। তাঁহার অন্তঃকরণ অতি উচচ ছিল। স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির মাত্র ।১০ অংশ নিজের

জন্য রাখিয়া তিনি অবশিষ্ট সম্পত্তি বন্ধুবান্ধব দিগকে দান করেন। তাঁহার প্রদত্ত সম্পত্তির এক অংশ হইতে তুষভাণ্ডার জমিদারীর সৃষ্টি হয়। "তুষভাণ্ডার" দ্রষ্টব্য।

রংপুর হইতে দক্ষিণমুখে একটি রাস্তা বাহির হইয়া এই জেলার মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ, পলাশবাড়ী এবং গোবিন্দগঞ্জ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান হইয়া বগুড়া পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহার অধিকাংশ কামতাপুর রাজগণ কর্তৃক নির্ম্মিত কামতাপুর হইতে ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত রাজপথের অংশ। রংপুর হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণে এই রাস্তার বড় দরগা নামক স্থানে নবাবী আমলের একটি প্রাচীন মসজিদ্ আছে। এখানে প্রসিদ্ধ সাধু ইসমাইল গাজীর ব্যবহৃত একটি গদা রক্ষিত আছে। রংপুর হইতে প্রায় ২৪ মাইল দক্ষিণে পীরগঞ্জ থানা। থানার ৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত কাঁটাদুয়ার গ্রামে গাজী ইসমাইলের মস্তক সমাহিত আছে। ইহাও মুসলমান দিগের একটি পবিত্র স্থান। ইসমাইল গাজীর সম্বন্ধে জানা যায় যে আরব দেশ তাঁহার জন্মভূমি। ভারতবর্ষে ভাগ্যান্বেষণ করিতে আসিয়া তিনি সম্রাট বারবাক শাহের সময়ে গৌড় রাজ্যের সেনা বিভাগে প্রবিষ্ট হন। গৌড় বিজয়ী প্রসিদ্ধ মহম্মদ-বিন-বখতিয়ার খিলজি আসাম বিজয়ে বিফল হওয়ার পর সম্রাটের আদেশে ইসমাইল গাজী কামরূপ রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং যুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া সম্রাটের করদ রাজা রূপে পরিণত করেন। কথিত আছে, ঘোড়াঘাটের হিন্দুরাজা তাঁহার প্রতিপত্তি দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়া সম্রাট্-দরবারে তাঁহার নামে সম্রাটের বিরুদ্ধে কামরূপ রাজের সহিত ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগ আনয়ন করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট ইসমাইলের শিরশ্ছেদের আজ্ঞা দেন। প্রবাদ, যে ইসমাইলের ছিন্ন মস্তক কাঁটাদুয়ারে এবং মুণ্ডহীন দেহ হুগলী জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদে (বর্ত্তমান আরামবাগ) গিয়া পড়ে। এই অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া লোকে ইসমাইলকে পীর জ্ঞানে তাঁহার দেহ ও মস্তকের সমাধিস্থলকে পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করে। কাঁটাদুয়ারের মসজিদের সংলগ্ন বহু পীরোত্তর জমি আছে।

পীরগঞ্জ থানা হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে চাত্রা গ্রামে কামতাপুর রাজ নীলাম্বরের একটি বিস্তৃত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। পীরগঞ্জ ও চাত্রার মধ্যে বড়বিল নামে ৩ বর্গ মাইল ব্যাপী একটি বিল দৃষ্ট হয়; ইহার দক্ষিণেও রাজা নীলাম্বরের গড়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

রংপুর হইতে ১৭ মাইল দক্ষিণে উপরিউক্ত পুরাতন রাজপথের কিছু পশ্চিমে, বড় দরগাহের প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে উদয়পুরে রাজা গোপীচন্দ্রের পুত্র ভবচন্দ্র বা উদয়চন্দ্রের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কুড়িগ্রাম স্টেশন দ্রষ্টব্য। ভবচন্দ্র বা হবচন্দ্র রাজা ও তাঁহার গবচন্দ্র মন্ত্রীর অদ্ভুত বুদ্ধি ও বিচার পদ্ধতির বহু কাহিনী আজিও জনসমাজে প্রচলিত আছে। রবীন্দ্র নাথ তাঁহার হিংটিং ছট্ কবিতা এইরূপে আরম্ভ করিয়াছেন;—

স্বপ্ন দেখেছেন রাত্রে হবুচন্দ্র ভূপ
অর্থ তার ভাবি ভাবি গবুচন্দ্র চুপ।

ভূতছাড়া—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ৩০ মাইল দূর। রংপুর জেলায় তামাকের ব্যবসায়ের ইহা একটি প্রধান কেন্দ্র; সুদূর বর্ম্মা হইতে মগ ব্যবসায়ীরা প্রতি বৎসর তামাক কিনিবার জন্য এখানে আসিয়া থাকেন।

তিস্তা জংশন—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ৩৮ মাইল দূর। কাউনিয়া জংশন ও এই স্টেশনের মধ্যে তিস্তা নদীর উপর একটি রেলওয়ে সেতু আছে।

তিস্তার সংস্কৃত নাম ত্রিস্রোতা। কালিকা পুরাণে লিখিত আছে যে একবার পার্ব্বতী এক দানবের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিবার সময়ে শিবভক্ত এই দানব শিবের নিকট তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জল প্রার্থনা করেন। শিবের বরে পার্ব্বতীর বক্ষ হইতে তিনটি ধারায় এই নদী বাহির হইয়া আসে। বেশী দিনের কথা নয় তিস্তা দক্ষিণে বহিয়া আত্রাই ও করতোয়ার খাতে পদ্মায় গিয়া পড়িত। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ভীষণ বন্যার সময়ে তিস্তা পুরাতন খাত ছাড়িয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বে বর্ত্তমান খাত কাটিয়া ব্রহ্মপুত্রে যাইয়া মিলিত হয়। তিস্তা জংশন হইতে একটি শাখা লাইন ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী কুড়িগ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখাপথে তিস্তা জংশন হইতে ৪ মাইল দূরে সিংহেরদাবড়ি-হাট স্টেশনের নিকটে বহুকাল হইতে প্রতি বৎসর মাঘ ফাল্গুন মাসে "সিন্দূরমতীর মেলা" নামে প্রায় এক সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা হইয়া থাকে। রংপুর জেলার সুপ্রসিদ্ধ মাণিক চন্দ্র ও গোপীচন্দ্রের গানের ময়নামতী ও সিন্দুরমতীর কথা ইহা স্মরণ করাইয়া দেয়; সম্ভবতঃ এই সিন্দুরমতী গ্রাম্য গীতিতে স্থান পাইয়াছেন এবং তাঁহার নামেই মেলাটি চলিয়া আসিতেছে।

কুড়িগ্রাম—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ৫৩ মাইল। ইহা রংপুর জেলার একটি মহকুমা। শহরটি ধরলা নদীর তীরে অবস্থিত ও পাটের কারবারের জন্য বিখ্যাত। এই স্থান হইতে ১০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে গিয়া ধরলা ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে। কথিত আছে, প্রাচীন কোচরাজ্য মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বিজিত হইলে উক্ত রাজ্যের কুচওয়ারা অঞ্চলের কুড়িটি মেচ পরিবার এই স্থানে আসিয়া বসবাস করেন বলিয়া ইহার নাম হয় কুড়িগ্রাম। এই মেচগণ এখন সম্পূর্ণরূপে বাংলার হিন্দু সমাজের কুরী নামক জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। কুড়িগ্রাম একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। ধরলা নদীর ভাঙনের জন্য শহরটির মধ্যে মধ্যে বিশেষ ক্ষতি হয়।

কুড়িগ্রাম হইতে ১১ মাইল দক্ষিণে উত্তর-বঙ্গের সুবিখ্যাত বাহিরবন্দ পরগণার প্রধান স্থান উলিপুর যাইতে হয়। বাহিরবন্দ পরগণার জমিদারী পূর্ব্বে কোচরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে রাজা পরীক্ষিতের সময়ে ইহা মুঘলগণ কর্ত্তৃক বিজিত হয়। এখন ইহা কাশীম-বাজারের মহারাজার সম্পত্তি হইয়াছে।

উলিপুরের ৫ মাইল পশ্চিমে ওয়াড়ি নামক স্থানে কতকগুলি ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহা গোপীচন্দ্র রাজার একটি বাটির ধ্বংসাবশেষ বলিয়া কথিত। প্রধান লাইনের ডোমার স্টেশন দ্রষ্টব্য। রংপুর জেলার "গোপীচন্দ্রের গান" নামক লৌকিক গাথা-সাহিত্যের নায়ক রাজা গোপী চন্দ্র বা গোপীচাঁদ কাহারও কাহারও মতে ১০০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; আবার কেহ কেহ তাঁহাকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। গোপীচাঁদ ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের অদুনা ও পদুনা নামক দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার জননী রাণী ময়নামতী হাড়িসিদ্ধা নামক এক সিদ্ধপুরুষের শিষ্যা ও যাদুবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন বলিয়া তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে নানারূপ দুর্নাম রটে। পত্নীদ্বয়ের পরামর্শে গোপীচাঁদ স্বীয় জননীকে উত্তপ্ত তৈলকটাহে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করেন। পরে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তিনি বিশেষ অনুতপ্ত হন ও স্বয়ং হাড়িসিদ্ধার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। বাংলার বাউলগণ গোপীযন্ত্র নামক যে বাদ্য যন্ত্রের সহিত গান করেন, উহা রাজা গোপীচাঁদের সময়ে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। গোপীচন্দ্রের গান রংপুর জেলার সর্ব্বত্র গীত হয় এবং ভারতবর্ষের নানাস্থানে ইহা অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

উলিপুর হইতে ১০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র কূলে চিলমারী একটি পুরাতন গ্রাম ও বাণিজ্য কেন্দ্র। চিলমারীর অপর পারে ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব কূলে গারো পাহাড়ের পাদদেশে কুড়িগ্রাম মহকুমার কিয়দংশ অবস্থিত ; তথায় রৌমারী একটি প্রসিদ্ধ বন্দর।

লালমণিরহাট জংশন—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ৪৪ মাইল দূর। ইহা রংপুর জেলার অন্তর্গত একটি নগণ্য গণ্ডগ্রাম ছিল, কিন্তু রেলের কল্যাণে এখন প্রায় শহরে পরিণত হইয়াছে। এখানে একটি বড় রেলওয়ে উপনিবেশ আছে।

ইহা বাংলা-দুয়ার (বেঙ্গল-ডুয়ার্স) রেলপথের সহিত একটি জংশন স্টেশন। এখান হইতে আরম্ভ হইয়া বাংলা-দুয়ার রেলপথ ১৩৩ মাইল দূরবর্ত্তী জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত তোর্‌সা নদীর ধারে মাদারীহাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। তোর্‌সা তিব্বতে উঠিয়া ভূটানের মধ্য দিয়া আসিয়া জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবেশ করে। মাদারীহাট হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে ফালাকাটা পাট, তামাক ও সরিষার বড় গঞ্জ। শ্রীপঞ্চমীর সময়ে এখানে একমাসব্যাপী একটি মেলা বসে। এই স্থানে আগে আলিপুর দুয়ার মহকুমার সদর ছিল। বাংলা-দুয়ার রেলপথের উভয় পার্শ্বে বহু চা-বাগান আছে। এই রেলপথে লালমণিরহাট হইতে যথাক্রমে ১৪ ও ১৭ মাইল দূরবর্ত্তী কাকিনা ও তুষভাণ্ডার দুইটি পুরাতন জমিদার বংশের বাসস্থান। কাকিনা প্রাচীন কোচরাজ্যের ছয়টি বিভাগের অন্যতম বিভাগ ছিল। এখানকার রাজবংশ দান ও বিদ্যানুরাগের জন্য প্রসিদ্ধ। কাকিনার রাজবাড়ীটি দেখিতে অতি সুন্দর। তুষভাণ্ডার জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম সীতারাম রায় চৌধুরী। তিনি স্বীয় সুহৃৎ আরিফ মহম্মদ চৌধুরীর নিকট হইতে তাঁহার সম্পত্তির পাঁচ আনা অংশ প্রাপ্ত হইয়া এই জমিদারীর পত্তন করেন (রংপুর দ্রষ্টব্য)। তুষভাণ্ডার এ অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ গঞ্জ। লালমণিরহাট হইতে ৪৬ মাইল দূরবর্ত্তী পাটগ্রাম স্টেশনও একটি বাণিজ্য প্রধান স্থান। পাটগ্রাম হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে তিস্তার পূর্ব্ব কূলে মেখলিগঞ্জ কোচবিহার রাজ্যের একটি উপবিভাগ ও গঞ্জ। পূর্ব্বে এখানে পাটের একপ্রকার সুন্দর রঙ্গীন গালিচা প্রস্তুত হইত; ইহাকে মেখলি বলিত।

বাংলা-দুয়ার রেলপথের সদর দপ্তর লালমণিরহাট হইতে ৬৯ মাইল দূরবর্ত্তী দোমোহানি নামক স্থানে অবস্থিত। এই স্থান হইতে একটি ছোট শাখা লাইন ৬ মাইল দূরবর্ত্তী জলপাইগুড়ি শহরের বিপরীত দিকে তিস্তা নদীর পূর্ব্ব তীরস্থ বার্ণেসঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। দোমোহানি হইতে ৪ মাইল পূর্ব্বদিকে ময়নাগুড়ি দুয়ার অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ময়নাগুড়ি রোডে একটি স্টেশনও আছে। ময়নাগুড়ি হইতে জলপেশ মন্দির ৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে ; (জলপাইগুড়ি দ্রষ্টব্য)। দোমোহানির পরবর্ত্তী স্টেশন লাটাগুড়ি জংশন হইতে অপর একটি শাখা ৬ মাইল দূরে রামশাই হাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। রামশাইহাট জলঢাকা নদীর তীরে অরণ্যের মধ্যে অবস্থিত। ব্যাঘ্রাদি শিকারের জন্য অনেকে এখানে আসিয়া থাকেন। জলঢাকা ভুটান হইতে উঠিয়া দার্জিলিং জেলার সীমান্ত দিয়া জলপাইগুড়ি জেলায় ঢুকিয়াছে ; তথা হইতে কোচবিহার রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়া রংপুর জেলায় তোরসা নদীর একটি শাখার সহিত মিলিত হইয়া ধরলা নামে পরিচিত হইয়াছে। লালমণিরহাট হইতে ৯০ মাইল দূরবর্ত্তী **মাল জংশন** এই রেলপথের একটি উল্লেখযোগ্য স্টেশন। ইহা একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। এখান হইতে একটি শাখা লাইন বাহির হইয়া ১১ মাইল

পশ্চিমে দার্জিলিং জেলার সীমান্তের নিকট বাগরাকোট পর্য্যন্ত গিয়াছে। মাল জংশনের পরবর্ত্তী স্টেশন চালসা আর একটি জংশন। এখান হইতে ৬ মাইল উত্তরে দার্জিলিং জেলার সীমান্তের নিকট মেটেলি পর্য্যন্ত একটি শাখা লাইন আছে।

ডুয়ার্স বা দুয়ার কথাটি ভুটিয়া ভাষার শব্দ, ইহার অর্থ পর্ব্বতের পাদদেশস্থ সমতল ভূমি। বেঙ্গল-ডুয়ার্স রেলপথের ভোটমারি, ভোটপট্টি, লাটাগুড়ি, বিন্নাগুড়ি প্রভৃতি স্টেশন ভোট জাতির স্মৃতি বহন করিতেছে। পূর্ব্বে এই অঞ্চল ভুটিয়াগণের অধিকারভুক্ত ছিল। আসাম বিজয়ের পর এই অঞ্চল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভুটিয়ারা যাহাতে কোনরূপ দৌরাত্ম্য না করে তজ্জন্য ইংরেজ সরকার হইতে ভুটানের রাজাকে বার্ষিক কিছু অর্থ দেওয়া হইত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভুটিয়ারা দুয়ার অঞ্চল দিয়া বাংলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে সুরু করায় বাংলা সরকার ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে য়্যাশলি ঈডেন সাহেবকে দূতরূপে ভুটান রাজসভায় প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে ভুটিয়াগণ কর্ত্তৃক অপমানিত হইলে ভুটিয়াগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এই যুদ্ধে প্রথমতঃ ইংরেজগণ তত সুবিধা করিতে পারেন নাই ; পরে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ভুটিয়াগণের বিরুদ্ধে বিপুল বাহিনী প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত ও বশীভূত করা হয়। দুয়ার অঞ্চল পূর্ব্বে সাধারণ বিধি বহির্ভূত একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল রূপে একজন ডেপুটি কমিশনারের দ্বারা শাসিত হইত ; পরে ইহাকে জলপাইগুড়ি জেলার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই অঞ্চল পূর্ব্বে জঙ্গলময় ও অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল। ভোটযুদ্ধে প্রেরিত বহু ইংরেজ সৈনিক ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিল। এখন এই অঞ্চল চা-উৎপাদনের একটি প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিণত হওয়ায়, ইহার জঙ্গল একরূপ লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয় এবং স্বাস্থ্যেরও বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

মোগলহাট—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ৫০ মাইল দূর। ধরলা নদীর পশ্চিম কূলে ইহা একটি বিখ্যাত পাটের কারবারের স্থান। মুঘল বা মোগলগণ যখন আসাম অভিযানে গমন করেন, তখন এই স্থানে তাঁহারা একটি বাজার বসাইয়াছিলেন বলিয়া ইহা মোগলহাট নামে পরিচিত। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময় এই স্থানে ইংরেজ সৈন্যগণের সহিত বিদ্রোহীদিগের কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল।

গিতলদহ জংশন—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ৫২ মাইল দূর। ইহা ধরলা নদীর পূর্ব্ব তীরে কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত। এখান হইতে একটি শাখা লাইন কোচবিহার রাজ্যের ভিতর দিয়া জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত দুয়ার অঞ্চলের দলসিংপাড়া ও জয়ন্তী পর্য্যন্ত গিয়াছে।

দিনহাটা—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ৬০ মাইল দূর। ইহা কোচবিহার রাজ্যের অন্তগত একটি বড় স্টেশন ও বাণিজ্য কেন্দ্র। এই স্থান হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে ধরলা নদীর তীরে গোসানীমারি গ্রামে প্রাচীন কামতা রাজ্যের রাজধানী কামতাপুরের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। প্রাসাদ ও গড়ের মৃণ্ময় প্রাকারের কিছু কিছু অংশ ও দুইটি ভগ্ন মন্দির এখনও বর্ত্তমান। ধ্বংসাবশেষটি এখনও রাজপাট নামে পরিচিত। কামতারাজ্য মহাভারতোক্ত প্রাগ্ জ্যোতিষপুর বা কামরূপেরই অংশ বিশেষ ছিল। পৌরাণিক ও তান্ত্রিক গ্রন্থে যথা, কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রে কামরূপের চতুঃসীমা এইভাবে নির্দ্দিষ্ট আছে : উত্তরে কাঞ্চনাদ্রি বা কাঞ্চনজঙ্ঘা, পশ্চিমে করতোয়া নদী, পূর্ব্বে দিক্করবাসিনী বা দিক্ষু নদী এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও লাক্ষা নদীর সঙ্গম। এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডের আকার একটি ত্রিভুজের ন্যায় এবং ইহা রত্নপীঠ, কামপীঠ, স্বর্ণ পীঠ ও সৌমার পীঠ এই চারি অংশে

বিভক্ত। ইহার পশ্চিমাংশ বা শৌমার পীঠ ঐতিহাসিকযুগে কামতা নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ অনেক স্থলে কামরূপ ও কামতা শব্দ তুল্যার্থজ্ঞাপক হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে খ্যেনবংশীয় নীলধ্বজ কামতা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কামদা বা কামতাদেবী তাঁহার উপাস্য দেবতা ছিলেন। দেবীর নামানুসারে তিনি রাজ্যের নাম কামতারাজ্য এবং রাজধানীর নাম কামতাপুর রাখেন। সাধারণ লোকে এই দেবীকে গোস্বামিনী সর্ব্বাধিশ্বরী বা গোসানী নামে অভিহিত করিত। এই জন্য পরবর্ত্তীকালে কামতাপুর গোসানীমারি নামে পরিচিত হয়। নীলধ্বজের পর যথাক্রমে চক্রধ্বজ ও নীলাম্বর কামতারাজ্যের অধীশ্বর হন। নীলাম্বর অতি শক্তিশালী নৃপতি ছিলেন। তিনি বাহুবলে কামরূপ রাজ্যের অধিকাংশ স্থান ও আধুনিক রংপুর জেলার প্রায় সমগ্র অঞ্চল স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণ সীমা ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষার জন্য নীলাম্বর রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কামতাপুর হইতে ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত যে প্রাচীন রাজপথ আছে উহার পার্শ্বে ঘোড়াঘাটের অদূরে নীলাম্বরের দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। নীলাম্বরের রাজ্যকালেই কামতা রাজ্যের পতন ঘটে। কথিত আছে, মন্ত্রী শচীপাত্রের পুত্র কোনও বিশেষ গর্হিত কর্ম্মের জন্য রাজা নীলাম্বর কর্ত্তৃক নিহত হন এবং তাঁহার মৃত দেহ রন্ধন করিয়া তাঁহার পিতা শচীপাত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান হয়। ইহা জানিতে পারিয়া মর্ম্মাহত শচীপাত্র নীলাম্বরের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য গৌড়েশ্বর হুসেন শাহকে কামতাপুর আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করেন। বহু বৎসর ধরিয়া কামতাপুর অবোরোধ করিয়া হুসেন শাহ ইহার দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করিতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি রাজা নীলাম্বরের নিকট দূত দ্বারা প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে তাঁহার বেগমগণ কামতাপুরের মহারাণীর সহিত দেখা করিতে চাহেন, সুতরাং বেগমগণের শিবিকাগুলি যেন দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবার ছাড়পত্র পায়। নীলাম্বর অসন্দিগ্ধচিত্তে ইহাতে সম্মতি দিলে হুসেন শাহ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বহু সৈনিককে শিবিকায় আবৃত করিয়া দুর্গমধ্যে প্রেরণ করেন। তাহারা অকস্মাৎ শিবিকা হইতে বাহির হইয়া অন্তঃপুর রক্ষিগণকে আক্রমণ করে ও নিরস্ত্র নীলাম্বরকে বন্দী করিয়া হুসেন শাহের নিকট আনয়ন করে। কথিত আছে, যে হুসেন শাহ নীলাম্বরকে একখানি লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া গৌড় অভিমুখে প্রেরণ করেন, কিন্তু পথিমধ্যে নীলাম্বর কোনরূপে পলায়ন করিবার সুযোগ পান এবং অরণ্য মধ্যে আত্মগোপন করেন, ইহার পর আর তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। রাজধানী কামতাপুর বহু প্রাচীরের দ্বারা সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য ছিল। ধরলা নদীর ভাঙ্গনে ইহার অনেকস্থান বর্ত্তমানে লুপ্ত হইয়া গেলেও যাহা বিদ্যমান আছে তাহা হইতেই নগরীটির বিশালতার কতকটা ধারণা করিতে পারা যায়। বুখানান হ্যামিলটন ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ইহার পরিধি ১৯ মাইল দেখিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এই স্থান অত্যন্ত জঙ্গলময় ছিল, কিন্তু এখন ইহার চারিদিকে চাষ আবাদ হওয়ায় এখানে যাইবার আর কোন অসুবিধা নাই। মহারাজা নীলধ্বজের প্রতিষ্ঠিত কামদা বা গোসানী দেবী প্রাচীন দুর্গমধ্যে এখনও নিত্যপূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে দিনহাটা স্টেশন হইতে গোসানামারি পর্য্যন্ত গোযান পাওয়া যায়।

কোচবিহার—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ৭৪ মাইল দূর। ইহা কোচবিহার নামক করদ-রাজ্যের রাজধানী। বাংলাদেশে দুইটি মাত্র করদ রাজ্য আছে, একটি কোচ বিহার, অপরটি ত্রিপুরা। কোচ বিহার রাজ্যের পরিমাণ ফল ১,৩১৮ বর্গ মাইল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কোচ বিহারের মহারাজা

১৩ টি তোপের সম্মানের অধিকারী। কোচবিহারের সহিত বাংলা সরকারের কোন রাজনৈতিক সম্বন্ধ নাই, ইহা ভারত সাম্রাজ্যের প্রাচ্য রাজ্যব্যূহের অন্তর্গত। শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য সমগ্র রাজ্য কোচবিহার সদর, মাথাভাঙ্গা, মেখলিগঞ্জ ও তুফান গঞ্জ এই চারি উপবিভাগে বিভক্ত। ইংরেজ শাসিত প্রদেশের ন্যায় এই রাজ্যেও হাইকোর্ট, নিম্ন আদালত, জেলখানা এবং স্বতন্ত্র পুলিস, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি আছে। তন্ত্রগ্রন্থে কোচবিহারের নাম "কোচবধূপুর" রূপে উল্লিখিত আছে। কথিত আছে, এই অঞ্চল শিবের অতি প্রিয় বিহারক্ষেত্র বলিয়া ইহার নাম "কোচ-বিহার" হইয়াছে।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কোচবিহার রাজ্য ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত সন্ধি সুত্রে আবদ্ধ হয়, তৎপূর্ব্বে ইহা সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য ছিল। পূর্ব্বকালে কোচবিহার প্রাচীন কামরূপ-খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কামতারাজ্যের শেষ রাজা নীলাম্বরের পতনের পর ("দিনহাটা" দ্রষ্টব্য) কোচনেতা বিশু বা বিশ্বসিংহ ক্ষদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য জাতিগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া একটি সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের বিজিত অঞ্চলের কতকাংশ অধিকার করিয়া আনুমানিক ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে কোচবিহার নামে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কোচজাতি প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতির একটি শাখা বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিশ্বসিংহের সময়ে কোচরাজ্য পূর্ব্বে কামরূপ জেলার বড়নদী ও পশ্চিমে করতোয়া নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কথিত আছে, বিশ্বসিংহ কামাখ্যার সুপ্রসিদ্ধ কামপীঠের আবিষ্কার করেন। "পাণ্ডু" স্টেশন দ্রষ্টব্য। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে বিশ্বসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মল্লদেব বা নরনারায়ণ রাজা হন। মল্লদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শুক্লধ্বজ বা চিলারায় কোচ বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বীর তৎকালে অতি অল্পই ছিল। তিনি বাহুবলে আহোম, কাছাড়, মণিপুর, জয়ন্তীয়া, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জয় করিয়া কোচ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করেন। এই সময়ে তাঁহার অপর ভ্রাতা কমলা ব্রহ্মপুত্রের ধার দিয়া যে সামরিক রাজপথ নির্ম্মাণ করেন তাহা এখনও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয় ও গোহাঁই কমলা আলি নামে পরিচিত। কামাখ্যা দেবীর বর্ত্তমান মন্দিরটি শুক্লধ্বজের চেষ্টায় নির্ম্মিত হয়। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের সুলতানের সহিত কোচ সাম্রাজ্যের সংঘর্ষ ঘটে এবং সেই যুদ্ধে মহাবীর চিলারায় পরাজিত ও বন্দী হন। নরনারায়ণ তখন সম্রাট আকবরের সহিত যোগ দিয়া গৌড় রাজ্য আক্রমণ করিয়া বহু দূর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে নরনারায়ণের মৃত্যুর পর কোচরাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। সঙ্কোশ নদীর পশ্চিম দিকের অংশ অর্থাৎ বর্ত্তমান কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার কিয়দংশ নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের ভাগে পড়ে, এবং সঙ্কোশ নদীর পূর্ব্বতীর ও ব্রহ্মপুত্র নদের উভয় তীরস্থ ভূভাগ চিলারায়ের পুত্র রঘুদেবের অধিকার ভুক্ত হয়। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এই দুই রাজ্যকে যথাক্রমে "কোচবিহার" ও "কোচহাজো" নামে অভিহিত করিয়াছেন। কোচবিহার রাজ্যের অধিকারী লক্ষ্মীনারায়ণ মুঘলদিগের সহিত যোগ দেন এবং দিল্লীর সম্রাটের করদ রাজা রূপে পরিণত হন। কোচহাজো রাজ্যের রাজধানী বড়পেটার অনতিদূরবর্ত্তী বড়নগর নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। আহোমগণ কোচহাজো রাজ্যের কিছু কিছু জয় করিয়াছিলেন। রঘুদেবের পুত্র পরীক্ষিতের সময়ে কোচবিহার ও কোচহাজো রাজ্যদ্বয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে সেই সুযোগে ১৬১২ খৃষ্টাব্দে মুঘলগণ কোচহাজো রাজ্য অধিকার করিয়া নিজেদের খাস্ শাসনাধীনে আনেন। পরে পরীক্ষিতের বংশধরগণ কয়েকটি জমিদারী লাভ করিয়া বর্ত্তমান বিজনি গ্রামে বসবাস করেন। "বিজনি" দ্রষ্টব্য।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ভুটিয়ারা কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করিলে কোচবিহাররাজ ওয়ারেন-হেষ্টিংসের সাহায্য গ্রহণ করেন; ভুটিয়ারা বিতাড়িত হন এবং লাসার লামার মধ্যস্থতায় শান্তি স্থাপিত হয়। অতঃপর ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিখে কোচবিহার রাজ্য ও ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

কোচবিহার শহর তোরসা নদীর তীরে অবস্থিত। পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ম্মিত বলিয়া কোচবিহার শহরটি দেখিতে অতি সুন্দর। তরুবীথিযুক্ত সরল ও প্রশস্ত রাজপথ, রাজপথের পার্শ্বস্থ শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ভূখণ্ড, প্রমোদ-উদ্যান, স্বচ্ছ সলিল পূর্ণ দীঘি-সরোবর ও আম, কাঁঠাল, গুবাক প্রভৃতি বৃক্ষের শ্রেণী শহরটিকে একটি সুন্দর কুঞ্জবনে পরিণত করিয়াছে। বাংলা দেশে এরূপ সুন্দর শহর নাই বলিলেও চলে। এখানকার বহু দ্রষ্টব্য বস্তর মধ্যে মহারাজার প্রাসাদ, গ্রন্থাগার, রাণীর বাগান নামক উদ্যান, ভিক্টোরিয়া কলেজ নামক প্রথম শ্রেণীর কলেজ-ভবন, মেয়েদের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, সাগর দীঘি ও মদনমোহনের মন্দির উল্লেখ যোগ্য। মদনমোহনের রাসযাত্রা উপলক্ষে মহা সমারোহ ও নানা স্থান হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। এ সময়ে এখানকার প্রসিদ্ধ রাসের পুতুল দেখিতে পাওয়া যায়। রাসযাত্রা মেলায় লোকশিল্পের নিদর্শন স্বরূপ কিছু কিছু দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। কোচবিহার শহরে রাজ-অতিথিশালা, হোটেল ও ডাকবাংলা প্রভৃতি থাকায় ভ্রমণকারীর পক্ষে এখানে থাকিবার কোনই অসুবিধা নাই।

কোচবিহার হইতে ১১ মাইল পূর্ব্বদিকে রায়ঢাক নদীর কূলে অবস্থিত এই রাজ্যের উপবিভাগ তুফানগঞ্জ অবস্থিত। জলঢাকা নদীর তীরে মাথাভাঙ্গা উপবিভাগটি কোচবিহার হইতে ১৬ মাইল পশ্চিমে এবং বাংলা-দুয়ার রেলপথের পাটগ্রাম স্টেশন হইতে ১২ মাইল পূর্ব্বদিকে।

বাণেশ্বর—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ৮০ মাইল দূর। এই স্থানটি কোচবিহার রাজধানীর উপকন্ঠে অবস্থিত। এখানে বাণেশ্বর নামক এক অতি প্রাচীন শিবের মন্দির আছে। কেহ কেহ বলেন, যে এই স্থান তন্ত্রোক্ত অন্যতম শৈবপীঠ। স্টেশনের অতি নিকটে একটি দীঘির পাড়ে তরু-কুঞ্জের মধ্যে মন্দিরটি অবস্থিত। ইহা প্রায় ৫০ ফুট উচ্চ এবং আনুমানিক আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত। ইহা কোচবিহারের মহারাজার সম্পত্তি। শিবরাত্রির সময়ে এখানে খুব বড় মেলা হয়।

আলিপুর দুয়ার—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ৮৬ মাইল দূর। ইহা জলপাইগুড়ি জেলার একটি মহকুমা। শহরটি কালজানি নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত এবং একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র। কর্ণেল হেদায়েৎ আলি খাঁ নামক একজন বীরপুরুষ ভুটান যুদ্ধে ইংরেজপক্ষে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁহার নামানুসারে এই স্থানের আলিপুর নাম হইয়াছে। ভুটানগণের নিকট হইতে এই স্থান বিজিত হইবার পর কর্ণেল হেদায়েৎ আলি ইহার প্রথম শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

আলিপুর দুয়ার হইতে ১০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে মহাকালগুড়ির চারিদিকে রায়ঢাক ও গদাধর নদীর মধ্যে প্রায় ৭০ বর্গ মাইল ব্যাপিয়া চার্চ্চ মিশনারি সোসায়েটির তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত খৃষ্টান সাঁওতালগণের একটি বসতি আছে; ইহার ১০টি গ্রাম হইতে নির্ব্বাচিত ১০ জন প্রধান ও ধর্ম্মযাজকের সভাপতিত্বে একটি মন্ত্রণা-সভা আছে। মহাকালগুড়িতে ডাক বাংলা গির্জা প্রভৃতি আছে এবং তথায় যাইবার জন্য স্টেশন হইতে মোটর বাস চলে। মহাকালগুড়ির পশ্চিম পার্শ্বে একটি পুরাতন গড়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

রাজাভাতখাওয়া জংশন—পার্বতীপুর জংশন হইতে ৯৬ মাইল দূর। ইহা দুয়ার অঞ্চলের বকসা নামক সংরক্ষিত বন বিভাগের অন্তর্গত অরণ্যজাত শাল, শিশু, খয়ের প্রভৃতি কাষ্ঠ চালানের প্রধান কেন্দ্র। এখানে বক্সা বন বিভাগের দপ্তর অবস্থিত। রাজাভাতখাওয়া এই অদ্ভুত নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত হয় যে, পূর্বে কোচ রাজ ও ভুটিয়া রাজের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধের পর যখন শান্তি স্থাপিত হয় তখন এই স্থানে সন্ধি ও শান্তি স্থাপন কালে কোচরাজের নিমন্ত্রণে ভুটিয়ারাজ আহারাদি করিয়াছিলেন।

এই স্থান হইতে একটি শাখা লাইন গভীর জঙ্গল ভেদ করিয়া ৯ মাইল উত্তরে জয়ন্তী পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখাপথে বক্সা রোড ও জয়ন্তী এই দুইটি স্টেশন আছে। অপর একটি শাখা লাইন উত্তর-পশ্চিমে ১৭ মাইল দূরবর্ত্তী দলসিংপাড়া পর্য্যন্ত গিয়াছে। শেষোক্ত শাখায় গারোপাড়া, কালচিনি, হ্যামিলটনগঞ্জ, হাসিমারা ও দলসিংপাড়া এই কয়টি স্টেশন ও উহাদের আশে পাশে বহু চা-বাগান আছে। কালচিনির চায়ের বাজারে নাম আছে। হাসিমারায় সুমিষ্ট আনারস পাওয়া যায়; হাসিমারা স্টেশন হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে তোর্ষা নদী পার হইয়া বাংলা-দুয়ার রেলপথের মাদারীহাট স্টেশন অবস্থিত। হ্যামিলটনগঞ্জের কাঠের কারবার প্রসিদ্ধ। দলসিংপাড়ার সুমিষ্ট কমলা লেবুর খ্যাতি আছে।

বকসা রোড—পার্বতীপুর জংসন হইতে বক্সা রোডের দূরত্ব ১০২ মাইল। অরণ্য মধ্যস্থ এই স্টেশন হইতে ভুটান সীমান্তের নিকট অবস্থিত বক্সা ছাউনী বা সেনা নিবাসে যাইতে হয়। স্টেশন হইতে বকসা প্রায় ৫ মাইল উত্তরে। প্রথম তিন মাইল পথ জঙ্গলের মধ্য দিয়া গিয়াছে। ইহার পর সাঁতরাবাড়ী নামক স্থান হইতে পাহাড়ী পথ সুরু হইয়াছে। রেল স্টেশন হইতে বক্সা পর্য্যন্ত বেশ ভাল রাস্তা আছে। মোটর কার বা এক্কা যোগে যাওয়া যায়। বক্সার সেনা নিবাস ভুটান পাহাড়ের সানুদেশে প্রায় ১৮০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। ইহার নিকটবর্ত্তী উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ ছোট সিঙ্কুলা প্রায় ২৪৫৭ ফুট উচ্চ। বক্সার পার্বত্যপথ দিয়া ভুটান তিব্বত ও মধ্য-এসিয়ায় যাওয়া যায়। ভুটিয়ারা যাহাতে বাংলার সমতল ভূমিতে আসিয়া অত্যাচার করিতে না পারে সেই জন্য উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে এখানে একটি সেনা নিবাস ও দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এই দুর্গটি বন্দীনিবাস রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এখানে ভুটিয়ারা গজদন্ত, মোম, মধু, কমলা লেবু, ভোট-কম্বল, মৃগনাভি, গণ্ডারের শৃঙ্গ ও এণ্ডি কাপড় প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আসে। বক্সার পথ দিয়া মধ্য-এশিয়া, তিব্বত ও ভুটান প্রভৃতি স্থান হইতে ভারতবর্ষে বহু পরিমাণে পশম আমদানি হয়। ভুটিয়ারা চাউল, তামাক, সুপারি ও বস্ত্রাদি কিনিয়া লইয়া যায়। সমুদ্রের উপর হইতে বক্সা সেনানিবাস ১,৮০০ ফুট উচ্চ; ইহা একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। সেনানিবাসের ৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত ৫,৬০৫ ফুট উচ্চ ছোট সিঙ্কুলা গিরিশৃঙ্গ জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে সর্বোচ্চ পর্বতশিখর; ইহার পর হইতেই ভুটান রাজ্যের আরম্ভ।

জয়ন্তী—পার্বতীপুর জংশন হইতে জয়ন্তী ১০৫ মাইল দূর। ইহার নিকটেই অরণ্য বেষ্টিত পর্বতমালা অবস্থিত। রাজাভাতখাওয়া হইতে গভীর জঙ্গল মধ্য দিয়া ট্রেন আসিবার সময়ে প্রায়ই বন-মুরগী প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই জঙ্গলের দৃশ্য সত্যই অতি মহান ও গম্ভীর। বন্য হস্তী ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র প্রাণী এই জঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায় এবং শিকারের জন্য বহু লোক এ অঞ্চলে আসিয়া থাকেন। জয়ন্তীতে একটি চূণের কারখানা আছে। এই স্থান হইতে অনতিদূরে

প্রসিদ্ধ "মহাকাল" শিবের স্থানে যাওয়া যায়। মহাকাল শিব অরণ্য মধ্যে পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। শিবের কোন মন্দির নাই। শিবস্থানের নিকট একটি বিরাট-আম্রবৃক্ষ ও একটি পুষ্করিণী অবস্থিত। শিবরাত্রির সময় এখানে পাহাড় অঞ্চল হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

ভুরঙ্গমারী—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ৬৬ মাইল। স্টেশন হইতে গ্রাম প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে রায়ঢাক বা দুধকুমার নদীর কূলে অবস্থিত। ইহা রংপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ গঞ্জ। দুধকুমার-তোর্সা কালজানি ও রায়ঢাকের মিলিত জলধারা বহন করে।

গোলকগঞ্জ জংশন—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ৭৬ মাইল দূর। ইহাই গোয়ালপাড়া জেলা ও আসাম প্রদেশের প্রথম স্টেশন। স্থানটি গঙ্গাধর নদের তীরে অবস্থিত এবং গোয়ালপাড়া জেলার একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। গঙ্গাধরের উপর একটি রেল সেতু আছে। এই স্থান হইতে একটি শাখা লাইন ১৩ মাইল দূরবর্ত্তী ধুবড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছে। গোলকগঞ্জ হইতে গঙ্গাধর নদের উপর নৌকাপথে যথাক্রমে ৮ ও ১৬ মাইল উত্তরে আগমনী ও তামারহাট গোয়ালপাড়া জেলার প্রসিদ্ধ গঞ্জ।

গৌরীপুর—ধুবড়ী শাখা পথে পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ৮৫ মাইল দূর। ইহা গঙ্গাধর নদের একটি শাখা গদাধর নদের তীরে অবস্থিত এবং একটি বর্দ্ধিষ্ণু বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে বিস্তৃত কাঠের ও পাটের কারবার আছে। সমগ্র আসামের মধ্যে গৌরীপুরের রাজা সব চেয়ে বড় জমিদার। একটি টিলার উপর অবস্থিত তাঁহার "মতিয়া বাগ" নামক প্রাসাদ এখানকার একটি প্রধান দ্রষ্টব্য। এই প্রাসাদে সম্রাট শের শাহের একটি তোপ আছে; উহা কনস্তানতিনোপল হইতে আনীত বিখ্যাত কারিগর সৈয়দ আহমদ কর্ত্তৃক নিম্মিত। গৌরীপুর হইতে ছয় মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত রাঙ্গামাটীতে সপ্তদশ শতাব্দীতে নিম্মিত বলিয়া কথিত একটি পুরাতন মসজিদ্ আছে। মুঘল আমলে এই স্থানে একটি ফৌজদারীর সদর ছিল।

ধুবড়ী—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ৮৯ মাইল দূর। ইহা গোয়ালপাড়া জেলার সদর শহর এবং ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত একটি বাণিজ্য প্রধান স্থান। শহরের পূর্ব্ব প্রান্তে গদাধর আসিয়া ব্রহ্মপুত্রে মিশিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন যে "ধোপা বুড়ী" কথা হইতে ধুবড়ী নাম হইয়াছে। তাঁহাদেব মতে এই অঞ্চলেই বেহুলা-লখীন্দরের ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং মনসার ভাসান গানে উল্লিখিত নিত্যা বা নেতা ধোপানীর পাট ধুবড়ীতে অবস্থিত ছিল। কোচবংশীয় রাজা পরীক্ষিৎ ধুবড়ীতে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মুঘল সেনাপতি মোকরম্ খাঁ ঐ দুর্গ অধিকার করিয়া ধুবড়ী জয় করেন। "কোচ বিহার" স্টেশন দ্রষ্টব্য। ধুবড়ী শিখ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। এই স্থানে একটি টিলার উপর তাঁহাদের দমদম গুরুদ্বার অবস্থিত। ইহা গুরু তেগ বাহাদুরের আদেশে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া কথিত।

ধুবড়ী শহরটি ব্রহ্মপুত্র তীরস্থ একটি উচচ টিলার উপর নিম্মিত। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। গোয়ালপাড়া জেলা আসাম প্রদেশের অন্তর্গত হইলেও এই জেলায় বহু বাঙালীর বাস আছে এবং ধুবড়ী প্রভৃতি অঞ্চলে বাঙালীদেরই প্রাধান্য।

অশোকাষ্টমী উপলক্ষে ধুবড়ীতে ব্রহ্মপুত্র স্নানের জন্য সহস্র সহস্র লোক সমাগম হয় ও মেলা বসে। এই মেলায় লোকশিল্পের নিদর্শন স্বরূপ কিছু কিছু জিনিষ পাওয়া যায়।

গোয়ালপাড়া—ধুবড়ী হইতে প্রায় ৪০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রের অপর বা দক্ষিণ তীরে গারোপাহাড়ের পাদদেশে গোয়ালপাড়া অবস্থিত। আসাম-সুন্দরবন ডেস্‌প্যাচ স্টীমার পথে ৯ ঘন্টার পথ। পূর্ব্বে এই স্থানেই জেলার সদর ছিল। যাতায়াতের সুবিধার জন্য পরে ধুবড়ীতে জেলার সদর স্থানান্তরিত করা হয়। বর্ত্তমানে গোয়ালপাড়া একটি অপ্রধান স্থানে পরিণত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র কূলে প্রায় ৪০০ ফুট উচচ পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই শহটির দৃশ্য অতি চমৎকার। গোয়ালপাড়া জেলার এলাকাভুক্ত স্থান এক সময়ে রংপুর জেলার অধীন ছিল। গোয়ালপাড়া শহরের বিপরীত দিকে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীরে অবস্থিত যোগীঘোপা একটি দ্রষ্টব্য স্থান। এখানে ব্রহ্মপুত্র তীরে পাহাড়ের গাত্রে কতকগুলি গুহা আছে। প্রবাদ, অতি প্রাচীন কালে এই স্থানে কয়জন যোগী তপস্যা করিতেন। এখানে দুধনাথ শিবের মন্দির নামে একটি প্রাচীন শিবমন্দিরও আছে। মুঘলেরা যখন আসাম আক্রমণ করেন, তখন আহোমগণ যোগীঘোপার গুহাগুলিকে দুর্গরূপে ব্যবহার করিয়া তাঁহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন। যোগীঘোপায় ইংরেজদের একটি কুঠি ছিল। এখনও চারটি নামহীন পুরাতন সমাধি দৃষ্ট হয়। যোগীঘোপা ধুবড়ী হইতে স্টীমার পথে গোয়ালপাড়ার ঠিক্ আগের স্টেশন। বঙ্গাইগাঁও স্টেশন হইতে যোগীঘোপা ২০ মাইল দক্ষিণে ; বরাবর ভালো রাস্তা আছে।

(ছ) গোলকগঞ্জ জংশন—রঙ্গিয়া জংশন—পাণ্ডু।

গোলকগঞ্জ জংশন ছাড়াইয়া পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের মাঝারি মাপের প্রধান লাইন গোয়ালপাড়া জেলার গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব মুখে চলিয়া গিয়াছে। জঙ্গল মধ্যে বা জঙ্গলের নিকটে অবস্থিত বাঁশবাড়ী, টিপকাই, সাপট গ্রাম, ফকিরাগ্রাম, কোকরাঝাড় ও বাসুগাঁও স্টেশন হইতে অরণ্য জাত কাষ্ঠাদি চালান যায়। রেলপথ সাপটগ্রামের নিকট সঙ্কোশ, কোকরাঝাড়ের নিকট সরলভাঙ্গা বা গৌরাং ও বাসুগাঁর নিকট চম্পামতী নদী পার হইয়াছে। নদীগুলি ব্রহ্মপুত্রে গিয়া পড়িয়াছে।

ফকিরাগ্রাম—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ১০৬ মাইল। স্টেশনের ১২ মাইল দক্ষিণে সঙ্কোশ ও গৌরাং নদী যে স্থানে ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে তাহার নিকট অবস্থিত বিলাসীপাড়া একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। ধুবড়ী হইতে গোয়ালপাড়া প্রভৃতি যাইতে স্টীমার পথে বিলাসীপাড়া একটি স্টীমার স্টেশন। ময়মনসিংহ জেলা হইতে আগত এখানকার জমিদার বংশের প্রসিদ্ধি আছে। বিলাসীপাড়া হইতে ৫ মাইল পশ্চিমে বগড়ীবাড়ীও একটি বাণিজ্য প্রধান স্থান ; পর্ব্বতজোয়ার জমিদার বংশের এক শাখার বাস এই স্থানে।

বঙ্গাইগাঁও—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ১৩০ মাইল। এখানে কমলা লেবুর বাগান আছে এবং নানা স্থানে ইহা চালান যায়। স্টেশন হইতে ১০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে উত্তর শালমরা একটি বড় গ্রাম ও থানা ; এখানকার এণ্ডি রেশমের খ্যাতি আছে। উত্তর শালমারা হইতে ৩ মাইল পূবব দিকে অভয়াপুরী গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ বিজনি রাজবংশের বাসস্থান। ইহারা কোচরাজবংশের এক শাখা। কোচবিহার স্টেশন দ্রষ্টব্য। এখানকার রাজ প্রাসাদে সাম্রাট্ শের শাহের কনস্তানুতি-নোপলের সৈয়দ অহ্মদ নির্ম্মিত একটি তোপ আছে। উত্তর শালমারা হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে যোগীঘোপা ; ইহার কথা ধুবড়ী প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

বিজনি—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ১৪০ মাইল। ইহা গোয়ালপাড়া জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। সরকারী কাগজপত্রে ইহা বিজনী দুয়ার নামে উল্লিখিত আছে। ভুটানের নীচে গোয়ালপাড়া জেলার উত্তরভাগও দুয়ার নামে অভিহিত হয়। বিজনির সংরক্ষিত বন ১৯৬ বর্গ মাইল ব্যাপিয়া অবস্থিত। এই বনে বাঘ, ভালুক, গণ্ডার প্রভৃতি জন্তু দৃষ্ট হয় এবং শাল, শিশু ও খয়ের গাছ বহু পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। বিজনির আগের স্টেশন চাপরাকাটা ও বিজনির মধ্যে রেল লাইন আই নদী পার হইয়াছে। বিজনি স্টেশনের কিছুদূরে রেল লাইন মনাস নদী পার হইয়াছে। এই নদীর পূর্ব্বপার হইতে কামরূপ জেলার তথা প্রকৃত আসামের আরম্ভ। কামরূপ দরং প্রভৃতি জেলায় বাঙালীদের সংখ্যা নগণ্য হইলেও বাঙ্গালী ভ্রমণকারীদের সুবিধার জন্য এ অঞ্চলের কয়েকটি প্রধান প্রধান স্থানের কথা নিম্নে বলা হইল।

সরভোগ—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ১৫১ মাইল। ইহা কামরূপ জেলার অন্তর্গত একটি বাণিজ্য কেন্দ্র; এই স্থান হইতে বহু পরিমাণে পাট চালান যায়। এই স্টেশনে ডাকগাড়ী প্রভৃতি সকল গাড়ীই থামে। স্টেশনের পরেই রেল লাইন মরামনাস বা বেকী নদী পার হইয়াছে।

বড়পেটা রোড—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ১৩৮ মাইল দূর। স্টেশন হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণে বড়পেটা শহর পর্য্যন্ত রেলের সহিত সংশ্লিষ্ট একটি মোটর বাস সর্ভিস আছে। বড়পেটা কামরূপ জেলার একটি মহকুমা। ইহা আসাম দেশীয় মহাপুরুষিয়া নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র। শঙ্করদেব ও তৎশিষ্য মাধবদেব এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইঁহারা শ্রীচৈতন্য দেবের প্রায় সমসাময়িক। ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে এক অসমীয়া কায়স্থবংশে শঙ্করদেব জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন কামরূপে তান্ত্রিক অভিচারের বীভৎসতা নিবারণের জন্য তিনি বৈষ্ণবমতের প্রচার করেন। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থোক্ত বিশুদ্ধ ভক্তি সাধন ও নাম সংকীর্ত্তনই এই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। ইঁহাদের দেবালয়গুলিতে সাধারণতঃ কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত থাকে না। এই স্থানে সকলে সমবেত হইয়া ভগবানের নাম গান করেন। এই দেবায়তনগুলি নামঘর কীর্ত্তনঘর বা সত্র নামে পরিচিত। শঙ্করদেব কায়স্থ ছিলেন বলিয়া প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণ তাঁহার প্রবর্ত্তিত নবধর্ম্মমত গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব ভগবদ্ভক্তি ও অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া পরে অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অন্যান্য মহাপুরুষগণের ন্যায় শঙ্করদেবের জীবন চরিতেও বহু অলৌকিক ঘটনার বিবৃতি আছে। অসমীয়াগণ তাঁহাকে অবতার স্বরূপ জ্ঞান করেন। মহাপুরুষ শঙ্করদেব কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বলিয়া এই সম্প্রদায় মহাপুরুষিয়া নামে পরিচিত। অসমীয়া ভাষাও শঙ্করদেবের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব ভক্তগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথির ন্যায় কামরূপ দেশীয় বৈষ্ণবগণও স্ব স্ব সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব উপলক্ষে সত্র সমূহে কীর্ত্তন মহোৎসবের আয়োজন করিয়া থাকেন। এই কীর্ত্তন গানগুলি অনেকটা বাংলা দেশের কীর্ত্তনের মত। বড়পেটা ধামের সত্রে প্রতি মাসেই কোন না কোন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বড়পেটার প্রধান সত্রে একটি কীর্ত্তন ঘর ও তাহার পার্শ্বে ভোজঘরে কোলিয়া ঠাকুর ও দোল-গোবিন্দ নামে দুইটি মূর্ত্তি ও শঙ্করদেব ও মাধবদেবের পুঁথি, চুল ও পদচিহ্ন সযত্নে রক্ষিত আছে। শঙ্করদেব ও মাধব দেবের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উৎসব আসামের সর্ব্ব প্রধান উৎসব গুলির অন্যতম। ইহা ছাড়া আসামের নিজস্ব "বিহু" উৎসবের কথা সকলেই শুনিয়াছেন। বড়পেটার সোনার তারের অলঙ্কার গুলির শিল্প কৌশল সত্যই অতি সুন্দর।

বড়পেটার প্রায় আট মাইল উত্তরে বড়নগরে কোচরাজ বলিনারায়ণ ও পরীক্ষিতের রাজধানী ছিল। উহার ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমানে জঙ্গলাবৃত হইয়া রহিয়াছে।

নলবাড়ী—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ১৮৬ মাইল দূর। কামরূপ জেলার ইহা একটি ক্ষুদ্র শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র। স্টেশনের কিছু পরে রেল লাইন পাগলাদিয়া নদী পার হইয়াছে।

রঙ্গিয়া জংশন—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ১৯৭ মাইল দূর। ইহা কামরূপ জেলার একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র। রঙ্গিয়ার কিছু পূর্ব্বদিকে বড়নদী কামরূপ ও দরং জেলার সীমা রক্ষা করিয়া দক্ষিণে যাইয়া ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে। রঙ্গিয়া হইতে দুই মাইল উত্তরে চেতনা গ্রামের নিকট রাজা অরিমত্তের রাজধানী বলিয়া কথিত বৈদারগড় নামে একটি সুবৃহৎ গড়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। গড়ের প্রতিদিকে প্রায় ৪ মাইল লম্বা করিয়া বাঁধ দিয়া ঘেরা। রঙ্গিয়া হইতে ১৭ মাইল উত্তরে ভুটান সীমান্তের নিকট দরঙ্গা এবং তথা হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে সুবলখাতা নামক স্থানদ্বয়ে প্রতি বৎসর শীতকালে প্রায় একমাস ব্যাপী একটি মেলা বসিয়া থাকে। ভুটিয়ারা মোম, গালা, লঙ্কা, কম্বল, টাট্টু ঘোড়া, ছাগল, ভুটিয়া কুকুর প্রভৃতি বিক্রয় করে ও সুতী ও রেশমীর কাপড়, কাঁসার বাসন প্রভৃতি কিনিয়া লইয়া যায়। দরঙ্গার ৬ মাইল উত্তরে একেবারে ভুটান সীমান্তে, কামরূপ জেলার অন্তর্গত দেওয়ানগিরি নামক একটি ভুটিয়া অধ্যুষিত গ্রাম আছে।

রঙ্গিয়া জংশন হইতে একটি শাখা লাইন পূর্ব্বদিকে দরং জেলার মধ্য দিয়া ৭৭ মাইল দূরবর্ত্তী উত্তর রঙ্গপাড়া জংশন পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখায় টাংলা, হরিশিঙ্গা, উদলগুড়ি, মাজবাট, ঢেকিয়াজুলি রোড, বেলসিরি উল্লেখযোগ্য স্টেশন এবং ইহাদের নিকটে বহু চা বাগান আছে। টাংলা হইতে প্রায় ১৭ মাইল দক্ষিণে মঙ্গলদাই দরং জেলার একটি মহকুমা। মঙ্গলদাইয়ের নিকটে ব্রহ্মপুত্রের উপর খরুপেটিয়া ঘাট একটি বড় বন্দর। ঢেকিয়াজুলি রোড হইতে প্রায় ১১ মাইল দক্ষিণে ঢেকিয়াজুলি একটি ক্ষুদ্র নগরী। উত্তর রঙ্গপাড়া তেজপুর-বালিপাড়া নামক রেলপথের সহিত একটি জংশন স্টেশন। দরং জেলার প্রধান শহর তেজপুর উত্তর রঙ্গপাড়া হইতে ১৭ মাইল দূর। ব্রহ্মপত্র নদের উপর অবস্থিত তেজপুর শহরটির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অতি মনোরম। তেজপুরের প্রাচীন নাম শোণিতপুর। পুরাণ অনুসারে এই স্থানে অসুররাজ বাণের রাজধানী ছিল। অসমীয় ভাষায় তেজ শব্দের অর্থ শোণিত; সুতরাং তেজপুরই যে প্রাচীন শোণিতপুর তাহা একরূপ নিঃসংশয়ে বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ ও বাণরাজের কন্যা উষা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইলে ইহা লইয়া তেজপুরের পশ্চিম প্রান্তরে বাণ রাজা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যুদ্ধ হয় বলিয়া কথিত। ইহার পর তাঁহাদের বিবাহ হয়। দিনাজপুর স্টেশন দ্রষ্টব্য। তেজপুরের অনতিদূরে উষা পাহাড় বাণরাজ দুহিতা উষার স্মৃতি বহন করিতেছে। তেজপুরের পূর্ব্ব প্রান্তে বামুনী পাহাড়ে কতক গুলি সুন্দর ও প্রাচীন পাথরের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ মনে করেন এই স্থানে পূর্ব্বে কোন রাজার রাজধানী ছিল।

আমিনগাঁও—পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে ২১৯ মাইল। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর কূলে অবস্থিত এই স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। আমিনগাঁওএর অপর পারে পাণ্ডু স্টেশন পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম-বাংলা রেলপথের জংশন রূপে গণ্য হয়। পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলপথের খেয়া জাহাজে আমিনগাঁও ও পাণ্ডুর মধ্যে যাত্রী ও মালগাড়ী পারাপার করিয়া থাকে। এই স্থানে একটি রেলওয়ে সেতু নির্ম্মাণের পরিকল্পনা আছে।

অশ্বক্রান্তা—আমিনগাঁও হইতে ৩ মাইল উত্তরে উত্তর গৌহাটি একটি বড় গ্রাম। ইহার দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রের অপর পারে সুপ্রসিদ্ধ গৌহাটি শহর অবস্থিত। উত্তর গোহাটির অশ্বক্রান্তা বা অশ্বক্রান্ত তীর্থের বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। উত্তর গৌহাটি সুপ্রসিদ্ধ চিলারায়ের পৌত্র কোচহাজোর রাজা

পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত ; তাঁহার নগর রক্ষার গড় প্রভৃতি এখনও বহুদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানে একটি উচ্চ পাহাড়ের উপর বহু সোপান পার হইয়া অনন্ত শয্যাশায়ী বিষ্ণুর মূর্ত্তি ও কূর্ম্মরূপী জনার্দ্দনের মন্দির আছে। পাহাড়ের পাদদেশে অশ্বক্রান্ত নামে একটি কুণ্ড আছে। ইহার অপর নাম অশ্বক্রান্ত গয়া। যাত্রীদের মধ্যে অনেকে এখানে স্নান, তর্পণ ও পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন। যোগিনীতন্ত্রে ও কালিকাপুরাণে কামাখ্যার কামপীঠের ন্যায় অশ্বক্রান্ত তীর্থের মাহাত্ম্য অতি বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে। যোগিনীতন্ত্রের মতে, অন্যান্য তীর্থে সহস্র বর্ষ মন্ত্র জপ করিয়া যে ফল পাওয়া যায় অশ্বক্রান্ত তীর্থে মুহূর্ত্তমাত্র মন্ত্র জপে তাহার সমান ফল হয়। এই স্থান মন্ত্রসিদ্ধির একটি বিশিষ্ট সাধন ক্ষেত্র বলিয়া বিবেচিত হয়।

অশ্বক্রান্তা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে জনশ্রুতি যে নরকাসুরের, মতান্তরে শোণিতপুররাজ বাণাসুরের সহিত যুদ্ধার্থী শ্রীকৃষ্ণের অশ্ব এই স্থানে বিশ্রাম করিয়া ক্লান্তি দূর করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম অশ্বক্রান্তা হইয়াছে। অন্যমতে রুক্মিণীকে হরণ করিয়া পলায়ন করিবার সময়ে শ্রীকৃষ্ণের ক্লান্ত অশ্ব এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিল। এখানে পর্ব্বত গাত্রে একটি অশ্বের খুর অঙ্কিত আছে। লোকের বিশ্বাস যে উহা শ্রীকৃষ্ণের অশ্বের পদচিহ্ন।

হাজো—যোগিনীতন্ত্রে কামরূপমণ্ডলের বহু তীর্থের মধ্যে কামাখ্যা, উমানন্দ ও মাধব বা হয়গ্রীব মাধব এই তিনটি তীর্থের কথাই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। মাধব বা হয়গ্রীব মাধবের মন্দির হাজো গ্রামে অবস্থিত। আমিনগাঁও হইতে বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে এই স্থান পর্য্যন্ত মোটরবাস পাওয়া যায়। আমিনগাঁও হইতে হাজোর দূরত্ব পশ্চিমে প্রায় ১২ মাইল। হাজো একটি প্রাচীন ও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামে নির্ম্মিত কাঁসা ও পিতলের দ্রব্যাদি ও এণ্ডির কাপড় সমগ্র আসামে বিখ্যাত।

একটি উচ্চ টিলার উপর মাধবের মন্দির অবস্থিত। প্রায় একশত বিস্তৃত সোপান অতিক্রম করিয়া মন্দিরের দ্বারদেশে পৌঁছিতে হয়। হাজোর মন্দিরটি আহোম স্থাপত্যের অতি সুন্দর নিদর্শন। ভূমি হইতে মন্দিরের চূড়া প্রায় ১৫০ ফুট উচ্চ। মন্দিরের গাত্রে বিষ্ণুর দশাবতার ও ইন্দ্র, যম, লক্ষ্মী প্রভৃতি বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। মন্দিরের পিছনে ভোগমণ্ডপ, সম্মুখে নাটমন্দির ও নাটমন্দিরের পার্শ্বে দোলমঞ্চ অবস্থিত। নাটমন্দির ও গর্ভমন্দিরের মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড হোমকুণ্ড আছে। মন্দিরের দ্বারদেশে একটি শিলালিপি আছে। উহা হইতে জানা যায় যে আহোমরাজ রুদ্রসিংহ এই মন্দিরের সংস্কার করিয়াছিলেন। মাধবের মূর্ত্তিটি দেখিতে ঠিক্ বুদ্ধমূর্ত্তির মত। অনেকে অনুমান করেন যে আসলে ইহা একটি বুদ্ধমূর্ত্তি। এখনও প্রতিবৎসর শীতকালে ভুটান হইতে বহু বৌদ্ধ এই মন্দিরে পূজা দিতে আসেন। দোলমঞ্চের পার্শ্বে বা নিম্নে একটি প্রাচীন নদীর খাত দেখা যায়। ইহা ব্রহ্মপুত্রনদের পরিত্যক্ত খাত বলিয়া অনেকের অভিমত। মন্দিরে উঠিবার সোপান শ্রেণীর সম্মুখে একটি বড় পুষ্করিণী আছে, ইহার জল বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়।

পুরাণে বর্ণিত আছে যে বেদ অপহরণকারী হয়শিরা বা হয়গ্রীব নামক দৈত্যকে বিনাশ করিবার জন্য বিষ্ণু হয়গ্রীব অবতার হইয়াছিলেন। এখানে কিন্তু মাধব অশ্ববদন নহেন, প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তিটির মুখ অতি প্রশান্ত ও সুন্দর, ঠিক ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তির মত।
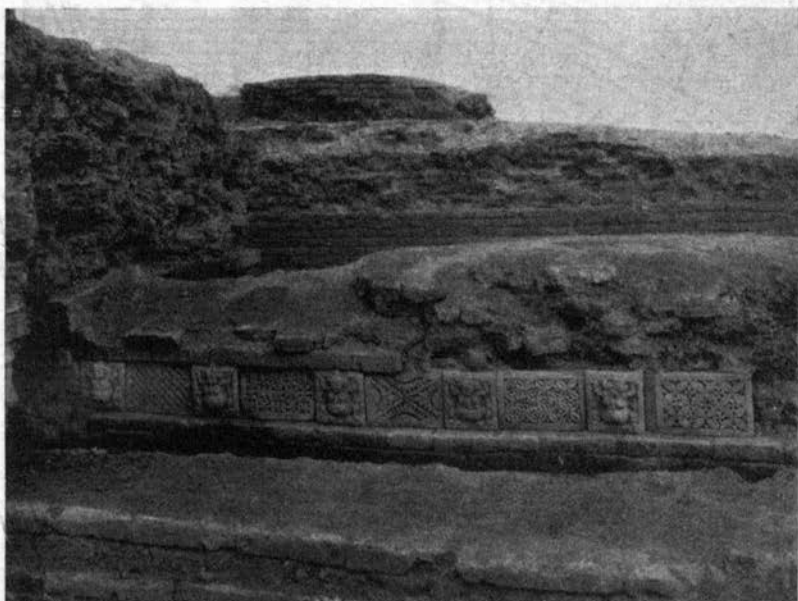
গোবিন্দ ভিটার কারুকার্য্য, মহাস্থানগড় (পৃষ্ঠা ১৩)
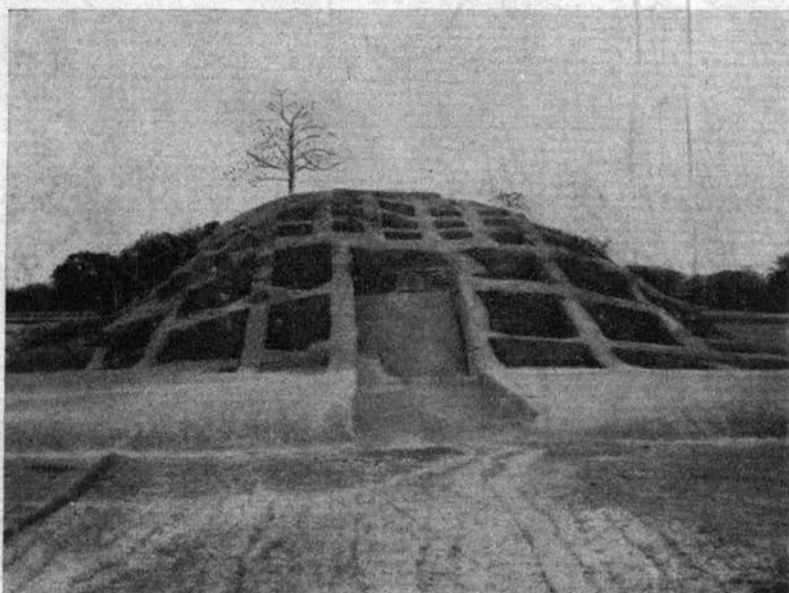
গোকুলের মেচ়, বগুড়া (পৃষ্ঠা ১৪)

ভবানী পাঠক কর্তৃক পূজিত কালীমূর্ত্তি, দেবীপুর, রংপুর (পৃষ্ঠা (১৮)

রংপুর কারমাইকেল কলেজ (পৃষ্ঠা ১৯)

তিস্তার সেতু (পৃষ্ঠা ২৭)

হরিশ্চন্দ্র রাজার পাট, রংপুর (পৃষ্ঠা ২[illegible])

কোচবিহার রাজপ্রাসাদ (পৃষ্ঠা ২৬)
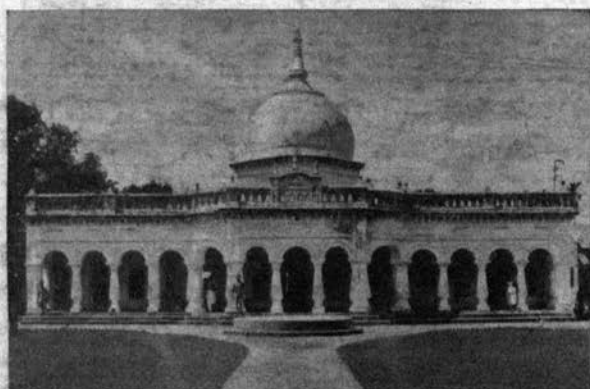
মদন মোহন মন্দির, কোচবিহার (পৃষ্ঠা ২৬)

মাধব মন্দিরের নিকটে একটি ছোট পাহাড়ে কেদার বা কামেশ্বর মহাদেবের মন্দির অবস্থিত। অদূরবর্ত্তী দুইটি পাহাড়ের নাম বেহুলা-লখীন্দর ও আর দুইটি পাহাড় ধুনি-মুনি নামে পরিচিত। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, যে বেহুলার ঘটনা এতদঞ্চলেই ঘটিয়াছিল। ধুবড়ীর নেতা ধোপানীর পাটের কথা এ প্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য।

হাজোর ডাক্‌বাংলার পিছনে মুকামারা নামে একটি ছোট পাহাড়ের উপর মুসলমানদের "পোয়া-মক্কা" নামে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। প্রবাদ, এখানে আসিলে নাকি হজের সিদ্ধি ফল পাওয়া যায়। এই স্থানে বহু মুসলমান যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

হাজো নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ যে "কোচ-হাজো" নামে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, সে কথা পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে। "কোচবিহার" দ্রষ্টব্য। হাজো নামক জাতি হইতেই গ্রামের নাম হাজো হইয়াছে, ইহাই অনেকের অভিমত। আবার কেহ কেহ বলেন যে এখানে পোয়া-মক্কায় অনেকে হজ করিতে আসেন বলিয়াই ইহার নাম হজো বা হাজো হইয়াছে। এরূপ একটি কাহিনীও প্রচলিত আছে, যে অতি পুর্ব্বকালে এই স্থানে একজন যোগীপুরুষ অতি কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। কামাখ্যার ডাকিনীগণের ছলনায় তাঁহার যোগভঙ্গ হইলে তিনি নাকি "হা যোগ! হা যোগ!" এই বলিতে বলিতে এই স্থান ত্যাগ করেন। সেই হইতে গ্রামের নাম হাযোগ বা সংক্ষেপে হাজো হইয়াছে।

জনশ্রুতি, যে এক সময়ে কামাখ্যার ডাকিনীগণ কামাখ্যাধামে অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ করিলে ভৈরব উমানন্দ তাহাদিগকে সেই স্থান হইতে দূর করিয়া দেন এবং সেই বিতাড়িতা ডাকিনীগণ এখানে আসিয়াই বসবাস করে।

হাজো হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র কূলে হাতিমুড়া নামে একটি পাহাড় স্টীমারে বহুদূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড়টিকে দেখিলে মনে হয় যেন বিরাটকায় হাতী হাটু গাড়িয়া বসিয়া আছে, এইজন্য ইহার নাম হইয়াছে হাতিমুড়া।

পাণ্ডু—আমিনগাওএর ঠিক বিপরীত দিকে ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ তীরে পাণ্ডু স্টেশন অবস্থিত। অনেকে বলেন যে এই স্থনের প্রাচীন নাম পাণ্ডুনগর; বনবাসকালে পাণ্ডুপুত্রগণ নাকি এই স্থানে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। পাণ্ডবেশ্বর বা পাণ্ডুনাথ নামে এখানে এক শিবের মন্দির আছে। মন্দিরটি একটি পাহাড়ের সানুদেশে অবস্থিত। কাহারও কাহারও মতে এই স্থানেই বিষ্ণুর সহিত মধুকৈটভের বাহুযুদ্ধ হইয়াছিল। প্রবাদ, এক সময়ে যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া বিষ্ণু শিলার আকার ধারণ করিয়াছিলেন। পাণ্ডবেশ্বর শিবের মন্দিরের নিকটবর্ত্তী এক খণ্ড প্রস্তর বিষ্ণুশিলা রূপে পূজিত হয়। কয়েক বৎসর হইল মুক্তানন্দ পরমহংস নামক একজন সাধুপুরুষের কয়েকজন শিষ্য এই স্থানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহাও এখানকার একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

পাণ্ডু স্টেশন হইতে আসাম-বাংলা রেলপথ গোহাটি, চাপারমুখ জংশন, লামডিং জংশন, প্রভৃতি হইয়া তিনসুকিয়া জংশন পর্য্যন্ত গিয়াছে। চাপারমুখ জংশন হইতে একটি শাখা দিয়া নওগাঁ যাওয়া যায়। লামডিং জংশন হইতে একটি লাইন দক্ষিণে বদরপুর জংশন হইয়া চট্টগ্রাম চলিয়া গিয়াছে। তিনসুকিয়া জংশন হইতে দিব্রু-সদিয়া রেলপথে একদিকে দিব্রুগড় ও অপর দিকে আসামের তৈল

ও কয়লার খনির অঞ্চলে ডিগ্‌বয়, মারঘারিটা, লিডো প্রভৃতি স্থানে যাইতে হয়। অম্বুবাচী মেলার সময়ে কামাখ্যা দর্শনেচ্ছু যাত্রীদের সুবিধার জন্য আসাম-বাংলা রেলপথ পাণ্ডু স্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে সাময়িক ভাবে কামাখ্যা নামে রেল স্টেশন খুলিয়া থাকেন।

কামাখ্যা—কামরূপ মণ্ডলের প্রধান তীর্থ কামাখ্যা আমিনগাঁও বা পাণ্ডু হইতে মাত্র দুই মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা ভারত বিখ্যাত একটি পীঠ স্থান। পাণ্ডু হইতে পদব্রজে বা মোটরবাসে এই পথটুকু যাওয়া যায়। কামাখ্যা-তীর্থ নীলাচল নামক একটি উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। পাহাড়ে উঠিবার তিনটি পথের মধ্যে কামাখ্যা রেল স্টেশনের দিক হইতে যে পথটি গিয়াছে উহাই শ্রেষ্ঠ। আমিনগাঁও হইতে যাঁহারা নৌকা বা স্টীমলঞ্চ যোগে কামাখ্যায় যাইতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মপুত্র তীর হইতে যে পথটি উঠিয়াছে উহাই সুবিধা। ইহা দ্বারবঙ্গের পরলোকগত মহারাজা পবনেশ্বর প্রসাদ সিংহ কর্ত্তৃক নিম্মিত। সচরাচর যাত্রিগণ কামাখ্যা-স্টেশনের দিকের পথটিই ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই পথ দিয়া উপরের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইলে পথের দুই দিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড দৃষ্ট হয়। এই প্রস্তরখণ্ডগুলি কামাখ্যা দেবীর আদি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বলিয়া কথিত। পর্ব্বত শৃঙ্গস্থ দেবীমন্দিরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে পথের পার্শ্বে একস্থানে পর্ব্বতগাত্রে খোদিত দুইটি বিশাল মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তিদ্বয় কামাখ্যার দ্বারপাল তাল ও বেতাল নামে পরিচিত।

কিংবদন্তী যে কামাখ্যার আদি মন্দির কামদেব কর্ত্তৃক নিম্মিত হইয়াছিল। হরকোপানলে ভস্মীভূত কামদেব এই স্থানে পূর্ব্বরূপ বা শরীর পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া এই প্রদেশ কামরূপ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আবার কাহারও মতে প্রাগজ্যোতিষপুর বা কামরূপের রাজা নরকাসুর কামাখ্যার মূল মন্দিরের নির্ম্মাতা। পুরাণে বর্ণিত আছে যে নরকাসুর বরাহরূপী বিষ্ণুর পুত্র। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী ও অত্যাচারী ছিলেন। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, যে নরকাসুর ষোল হাজার কুমারী কন্যাকে স্বীয় অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে যুদ্ধে নিহত করিয়া এই কুমারী গণের উদ্ধার সাধন ও স্বয়ং তাঁহাদিগকে বিবাহ করেন। জনশ্রুতি, যে নরকাসুর নীলাচলের উপরিস্থিত কামপীঠের রক্ষক ছিলেন এবং কামাখ্যা দেবীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হন। কামাখ্যা দেবী তাঁহাকে বলেন যে নরকাসুর যদি একরাত্রির মধ্যে তাঁহার জন্য একটি মন্দির ও পুকুর এবং পর্ব্বত শৃঙ্গ পর্য্যন্ত একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে পারেন, তবেই তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিবেন। নরকাসুর একরাত্রির মধ্যেই মন্দির নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খনন করেন, কিন্তু রাস্তাটি প্রায় শেষ হয় হয়, এমন সময়ে কামাখ্যা দেবীর মায়ায় একটি মোরগ ডাকিয়া উঠে। ইহাতে কামাখ্যা দেবী বলেন যে কুক্কুট ডাকিলেই রাত্রি প্রভাত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সুতরাং নরক তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে না পারায় কামাখ্যা দেবীকে বিবাহ করিবার দাবী আর করিতে পারেন না। ইহা:তে নরক সেই কুক্কুটটির উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে কাটিয়া ফেলেন। যে স্থানে এই ঘটনাটি ঘটে উহা কুকড়াকাটা নামে পরিচিত। এই গ্রামটি গৌহাটির নয় মাইল উত্তরে অবস্থিত। কামাখ্যার রেল স্টেশনের নিকট হইতে মন্দির পর্য্যন্ত রাস্তাটি নরকাসুরের দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া কথিত হয়।

পৌরাণিক যুগের পর কামাখ্যার মহাপীঠ বহুদিন লুপ্ত অবস্থায় ছিল। কোচরাজ বিশ্বসিংহ এই মহাপীঠের আবিষ্কার ও পুনঃ প্রকাশ করেন। কথিত আছে, রাজা বিশ্বসিংহ প্রতিপক্ষীয় পার্ব্বত্য জাতিকে দমন করিবার জন্য সসৈন্যে গৌহাটিতে গিয়া উপস্থিত হন। একদা রাজা বিশ্ব-

সিংহ স্বীয় ভ্রাতা শিবসিংহের সহিত নীলাচলের উপরিভাগে গমন করেন। সেখানে কাহারও সাক্ষাৎ না পাইয়া দুই ভ্রাতা ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে একটি বটবৃক্ষতলে একটি মাটির ঢিবির পার্শ্বে একজন বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইলেন। ভ্রাতৃদ্বয় অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলেন। সেই মৃত্তিকার ঢিবির মধ্য হইতে জলধারা নির্গত হইতেছিল। বৃদ্ধা সেই জল দ্বারা তাঁহাদের পিপাসার নিবৃত্তি করাইলেন। বৃদ্ধার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া রাজা বুঝিতে পারিলেন যে ইহা নিশ্চয়ই কোন শক্তিপীঠ। তিনি সেখানে মানত করিয়া আসিলেন যে যদি দেবীর দয়ায় তাঁহার রাজ্য নিষ্কণ্টক হয় তবে তিনি সোণার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। ইহার অত্যল্পকাল পরে বিশ্বসিংহ রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠ হন। তাঁহার পণ্ডিতগণ শাস্ত্রালোচনার দ্বারা এই মহাপীঠকে কামপীঠ বলিয়া নির্ণয় করেন। মৃত্তিকা খনন করিয়া বিশ্বসিংহ মহামুদ্রা পীঠ ও প্রাচীন মন্দিরের অধোভাগ আবিষ্কার করেন এবং মন্দিরের পুনঃ নির্ম্মাণ করিয়া সোণার পরিবর্ত্তে প্রতি ইষ্টকখণ্ডে এক রতি করিয়া সোণা দিয়াছিলেন। প্রবাদ যে কামাখ্যা দেবীর পীঠের সম্মুখে একজন ঢাকী ঢাক বাজাইত এবং তাহা শুনিয়া দেবী কামাখ্যা ভাবাবেশে বিবস্ত্রা হইয়া ঢাকের বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিতেন। ঢাকীর মুখে এই কথা শুনিয়া রাজা বিশ্বসিংহ একদিন এই নৃত্য দেখিয়া ফেলেন; ইহাতে অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া দেবি ক্রোধভরে হাতের দ্বারা ঢাকীর মাথা কাটিয়া ফেলেন এবং বিশ্বসিংহকে অভিসম্পাত করেন যে তাঁহার বংশধর কেহ কামপীঠ দর্শন করিলে বংশ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই কারণে কোচবিহারের রাজবংশীয়গণ নাকি কামাখ্যা দর্শন করেন না। কথিত আছে, বহু দেবমন্দির ভগ্নকারী কালাপাহাড় কামাখ্যা দেবীর প্রাচীন মন্দির ভগ্ন করেন। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে কোচবিহারের রাজভ্রাতা ও সেনাপতি শুক্লধ্বজ বা চিলা রায় বহু অর্থ ব্যয়ে বার বৎসর কাল ধরিয়া কামাখ্যা দেবীর মন্দির পুনরায় নির্ম্মাণ করেন। চিলা রায়ের কামরূপ জয়ের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। (কোচবিহার স্টেশন দ্রষ্টব্য)।

বর্ত্তমান নাটমন্দিরে যে শিলালিপি আছে তাহাতে লেখা আছে নৃপতি মল্লদেব (নরনারায়ণ) যিনি দয়াগুণে অতুলনীয়, ধনুর্ব্বিদ্যায় যিনি অর্জ্জুনের তুল্য, দানে যিনি কর্ণের সমান ও দধীচির ন্যায় মহৎ, যিনি সকল গুণের সাগর, সকল শাস্ত্রে পারগ, যাঁহার চরিত্র অসাধারণ, রূপে যিনি কামদেবের তুল্য,—সেই মল্লদেব কামাখ্যা দেবীর একজন সেবক। তদীয় ভ্রাতা শুক্লদেব (শুক্লধ্বজ) ১৪৮৭ শকাব্দে নীলাচলে দুর্গা দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

আসামের অনেক মন্দিরের মত কামাখ্যা মন্দিরের উপরিভাগ উল্টানো ধামার মত। সম্মুখস্থ নাটমন্দিরের ছাদে এইরূপ পাঁচটি চূড়া আছে। তাহার পরেই ভোগ মণ্ডপের ছাদ দেখিতে ঠিক চালাঘরের মত। মন্দিরের গাত্রে অষ্টাদশ ভৈরব ও চৌষট্টি যোগিনীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। মন্দিরের বহির্ভাগে কোচরাজ নরনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজের প্রস্তরখোদিত প্রতিমূর্ত্তি অবস্থিত। প্রাচীন মন্দিরের প্রস্তরময় ভিত্তির উপর মন্দিরটি নির্ম্মিত। কয়েকটি সিঁড়ি বাহিয়া নীচে গর্ভমন্দিরের মধ্যে কামপীঠ বা মহামুদ্রা দর্শন করিতে হয়। এখানে দেবীর কোন প্রতিমূর্ত্তি নাই, একখণ্ড দ্বিধাবিভক্ত শিলাপট্টই কামপীঠের প্রতীক। যাত্রিগণ প্রদীপের ক্ষীণ আলোকের সাহায্যে দেবীর দর্শন, স্পর্শন ও অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। কামপীঠের নিকটে অনেকগুলি অষ্টধাতু নির্ম্মিত দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের পার্শ্বেই সৌভাগ্যকুণ্ড নামক একটি পুষ্করিণী আছে। ইহা ইন্দ্রাদিদেবগণের দ্বারা খনিত ও সর্ব্ব তীর্থের জলের দ্বারা পূর্ণ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। লোকের বিশ্বাস যে ইহার জলে স্নান করিলে হতভাগ্যেরও ভাগ্য ফিরিয়া যায়। যাত্রীরা এখানে জলস্পর্শ স্নান, তর্পণ ও পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন। নাটমন্দিরের সম্মুখে অথচ এক পার্শ্বে পশু বলির স্থান। পূর্ব্বে এখানে বন্য বরাহও বলি হইত। এখন ছাগ ও মেষ বলি হয়।

যোগিনী তন্ত্রে ও কালিকাপুরাণে কামরূপের মাহাত্ম্য অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে এবং কামরূপ মণ্ডলে যে বহু মহাতীর্থ বিরাজিত তাহারও উল্লেখ আছে। এই সকল তীর্থের মধ্যে নীলাচলের উপর অবস্থিত কামপীঠের মাহাত্ম্যই আবার সবচেয়ে বেশী। কালিকা পুরাণে আছে,

"তীর্থান্তরে গবাং কোটিং বিধিবদ্ যঃ প্রযচ্ছতি।
একাহঞ্চ বসেদত্র তয়োস্তুল্যং ফলং লভেৎ॥"

অর্থাৎ, অন্যতীর্থে কোটি গো-দান করিলে যে ফল হয়, এখানে একদিন মাত্র বাস করিলে তাহার সমান ফল হয়।

কামাখ্যা মন্দিরের নিকটে ছিন্নমস্তা দেবীর মন্দির, নবগ্রহের মন্দির প্রভৃতি আরও অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির আছে। কামাখ্যা দেবীর মন্দির হইতে প্রায় এক মাইল দূরে নীলাচলের সর্ব্বোচ্চ শিখরে ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের নিকটে দ্বারবঙ্গের মহারাজার একটি সুন্দর বাটী আছে। এই স্থান হইতে চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। নীচে পাহাড়ের পাদমূলে ব্রহ্মপুত্রের রজত ধারা, অদূরে ব্রহ্মপুত্র নদ মধ্যে বৃক্ষলতা সমাচ্ছন্ন উমানন্দ দ্বীপ, উত্তরে সুদূর ভুটানের সুনীল পর্ব্বতমালা ও তুষারাচ্ছন্ন গিরিহস্ত, পূর্ব্বে গৌহাটি শহর ও সমতল ভূমি ও দক্ষিণে খাসি পর্ব্বতমালার দৃশ্য সত্যই অতি মনোরম। বর্ষার পর তরুরাজির শ্যামলিমা অনির্ব্বচনীয় হইয়া উঠে।

কামাখ্যা গ্রামে কোন ধর্ম্মশালা নাই। এখানে পাণ্ডাদিগের গৃহেই যাত্রীদের আহার ও বাসস্থান উভয়ই মিলে। এখানকার পাণ্ডাদের সৌজন্যের কথা ভারত বিখ্যাত। বর্ত্তমানে কামাখ্যায় প্রায় তিনশত ঘর পাণ্ডার বাস। আসামের আহোমরাজারা প্রথমে খাঁটি হিন্দু ছিলেন না ; এমন কি ইহাদের মধ্যে অনেকেই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণকে উৎপীড়নও করিয়াছেন। রাজা প্রতাপসিংহ ১৬১১-৪৯ খৃষ্টাব্দে বৈষ্ণবদিগের উপর বহু অত্যাচার করিয়াছিলেন। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে রাজা গদাধর সিংহও বৈষ্ণবদিগকে উৎপীড়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপুত্র রাজা রুদ্র সিংহ স্বয়ং বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং সুপ্রসিদ্ধ শান্তিপুরের কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কামাখ্যা মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণরামের বংশধরগণ আসামে পার্ব্বতীয়া গোসাই নামে পরিচিত।

স্মরণাতীত কাল হইতেই কামরূপ-কামাখ্যা তান্ত্রিক সাধনার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে সম্মানিত। এখানকার তান্ত্রিকগণের অসাধারণ কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। কামরূপ-কামাখ্যার গুণজ্ঞান বা তুক্তাকের দোহাই আজিও বহু লোককে দিতে দেখা যায়। পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে কামাখ্যায় গেলে কামরূপ-সুন্দরীরা লোককে ভেড়া করিয়া রাখিয়া দেয়। তান্ত্রিক অভিচারের কেন্দ্ররূপে কামাখ্যাকে লোকে পূর্ব্বে ভীতি মিশ্রিত সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিত। কথিত আছে, যে স্বনামধন্য শঙ্করাচার্য্য কামাখ্যার তান্ত্রিকগণের মন্ত্রাভিচারের ফলে রোগগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। বাংলার লোকসাহিত্যে কাঙুর বা কামাখ্যার গুণজ্ঞানের সম্বন্ধে বহু উল্লেখ আছে। মহাকবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর "ধর্ম্মমঙ্গল" কাব্যে উল্লিখিত আছে যে মহাবীর লাউসেন কামরূপ জয় করিতে গেলে নায়ানদ ব্রহ্মপুত্রের জলোচ্ছ্বাসে তাঁহার সমস্ত সেনাবাহিনী ভাসিয়া যায়। পরে স্বীয় উপাস্য দেবতা ধর্ম্মের প্রভাবে তিনি কাঙর (কামরূপ) রাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন।

অম্বুবাচীই কামাখ্যার সর্ব্বপ্রধান উৎসব। অম্বুবাচী নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের দ্বার খোলা হয়। এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আগত সহস্র সহস্র নরনারীর আগমনে কামাখ্যাধাম

কামাখ্যার মন্দির (পৃষ্ঠা ৩৪)
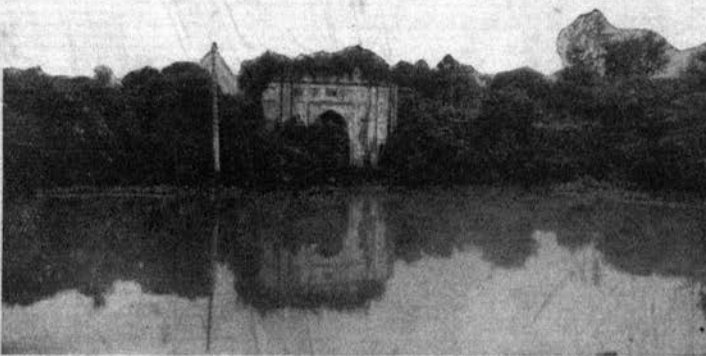
জলদুর্গের তোরণ, নারায়ণগঞ্জ (পৃষ্ঠা ৪৮)
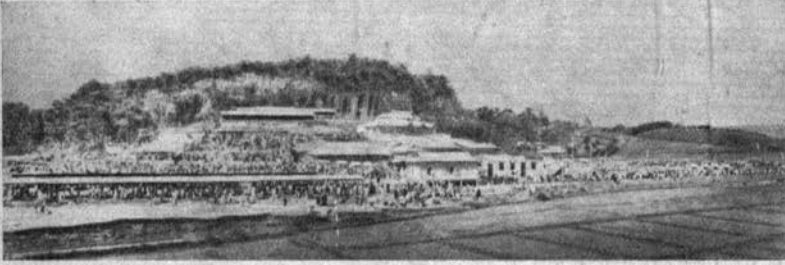
ঘোড়দৌড়ের মাঠ শিলং, (পৃষ্ঠা ৩৯)

পাইন তরুর অন্তরালে শিলং (পৃষ্ঠা ৩৯)

মুখরিত হইয়া উঠে। দুর্গাপূজার মহাষ্টমী ও চৈত্রমাসে অশোকাষ্টমী তিথিতেও এখানে বহু নরনারীর সমাগম হয়। তাহা ছাড়া বৎসরের সর্ব্ব সময়েই এখানে ধর্ম্মপ্রাণ তীর্থযাত্রিগণ আগমন করিয়া থাকেন।

উমানন্দ—কামাখ্যা দেবীর ভৈরব বা রক্ষক উমানন্দ মহাদেবের মন্দির ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যে একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। কামাখ্যা হইতে এই স্থানের দূরত্ব প্রায় দুই মাইল। গৌহাটি শহরের খেয়াঘাট হইতে স্টীমলঞ্চ অথবা নৌকাযোগে এই দ্বীপে যাইতে হয়। বর্ষাকালে নৌকায় যাওয়া নিরাপদ নহে, কারণ এই সময়ে ব্রহ্মপুত্রে অত্যন্ত প্রবল স্রোত বহিতে থাকে। হরিদ্বর্ণ বৃক্ষাদি শোভিত উমানন্দ দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড়ই মনোরম। উমানন্দ পাহাড়টির উচচতা তত বেশী নহে, তবে ইহার সিঁড়িগুলি কতকটা খাড়াভাবে অবস্থিত। ভৈরবের মন্দিরে যাইতে পথের দুইদিকে পলাশ, গোলক চাঁপা, কাঁঠাল, আম, নারিকেল, শিমুল, তেঁতুল প্রভৃতি গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র দ্বীপটিতে কতকগুলি অদ্ভুত জাতীয় উল্লুক আছে। ইহাদের লাঙ্গুল দীর্ঘ, গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণ ও মুখ হনুমানের মত। নিকটবর্ত্তী আর কোথাও এই শ্রেণীর উল্লুক দেখিতে পাওয়া যায় না। যাত্রীরা ইহাদিগকে কলা প্রভৃতি খাইতে দিয়া থাকেন। উমানন্দের মন্দিরটি একচুড়া বিশিষ্ট; ইহার স্থাপত্য প্রণালীও কামাখ্যা মন্দিরের ন্যায়। কামাখ্যার ন্যায় এখানেও গুহামধ্যে নামিয়া দীপালোকের সাহায্যে দেবদর্শন করিতে হয়। উমানন্দ শিবলিঙ্গটি পিতল নির্ম্মিত পঞ্চমুখী ডেকচির দ্বারা আবৃত। ভৈরবের নিকটেই দ্বাদশটি শালগ্রাম ও অষ্টধাতু নিম্মিত দশভুজ ও পঞ্চ মস্তক বিশিষ্টা চণ্ডীর বিগ্রহ অবস্থিত। মন্দির-গহ্বরে একটি ক্ষুদ্র কুণ্ড আছে। ইহা ভোগবতী গঙ্গা নামে পরিচিত। উমানন্দ দ্বীপে ভৈরবের সেবায়েত ভিন্ন অপর কাহারও বাসস্থান নাই। উমানন্দের মন্দিরের উত্তর দিকে আর একটি ভগ্নপ্রায় প্রাচীন মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার নিকটে বৈদ্যনাথ নামক অপর একটি শিব বিরাজমান।

কথিত আছে, যে পুর্ব্বে উমানন্দ শৈল নীল পর্ব্বত বা কামাখ্যার সহিত অবিচ্ছিন্ন ছিল। কালক্রমে ব্রহ্মপুত্রের স্রোতের বেগে ইহা মূলপর্ব্বত শ্রেণী হইতে পৃথক হইয়া একটি দ্বীপে পরিণত হইয়াছে। শিবরাত্রির সময় উমানন্দ শৈলে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। যাঁহারা কামাখ্যা দশন করিতে যান তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উমানন্দ দর্শন করিয়া থাকেন।

উমানন্দ শৈলের উত্তর দিকে ব্রহ্মপুত্র গর্ভে উর্ব্বশী নামে আর একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। এখানে উর্ব্বশী কুণ্ড নামে একটি তীর্থ ছিল, বর্ত্তমানে উহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই ক্ষুদ্র দ্বীপটি বর্ষাকালে জলমগ্ন হইয়া যায় বলিয়া জলযানের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য উহার উপর একটি শুভ্রবর্ণ স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত আছে।

গৌহাটি—কামরূপ জেলার সদর ও আসামের সর্ব্বপ্রধান শহর গৌহাটি কামাখ্যা হইতে মাত্র দুই মাইল দূর। পাণ্ডু হইতে ট্রেণে, মোটরবাসে অথবা ঘোড়ার গাড়ীতে গৌহাটি যাওয়া যায়। অসমীয়াগণ গৌহাটিকে "গুয়াহাটি" বলেন। ইহার পূর্ব্ব নাম গুবাক হাটি। ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত গৌহাটি একটি সুন্দর ও পরিপাটী শহর। উত্তর তীরে উত্তর গৌহাটি নামে একটি গ্রাম আছে।

অতি প্রাচীনকালে মহীরাং দানব নামে একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। ইহাকে অসুর বংশীয় রাজাদের আদিপুরুষ বলা যাইতে পারে। এই বংশে নরকাসুর কিরাত-বংশীয় কামরূপের রাজা ঘটককে পরাজিত করিয়া কামরূপের সিংহাসন লাভ করেন। নরকাসুরের নাম পুরাণ ও তন্ত্রে উল্লিখিত আছে। নরকাসুর কামরূপের রাজধানী বর্ত্তমান গৌহাটিতে স্থাপন করিয়াছিলেন। সে সময়ে গৌহাটির নাম ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। নগরের চারিদিকে পরিখা ও প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া তিনি নগরকে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। গৌহাটির কাছে একটি ছোট পাহাড় এখনও নরকাসুরের পাহাড় নামে পরিচিত।

ঐতিহাসিকযুগে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বঙ্গরাজ শশাঙ্ক কামরূপ জয় করিয়া বঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। প্রসিদ্ধ চৈনিক পর্য্যটক য়ুয়ান চোয়াং সেই সময়ে ভারত ভ্রমণে আসেন এবং কামরূপ দর্শন করেন। একাদশ শতাব্দীতে কামরূপ পালরাজগণ কর্ত্তৃক বিজিত হয় এবং ষোড়শ শতাব্দীতে কোচরাজ-সেনাপতি চিলারায়ও কামরূপ জয় করেন।

বাংলার স্বাধীন মুসলমান রাজারা এককালে গৌহাটি পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। সুলতান শমস্‌উদ্দীন ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকন্দর শাহ্ ১৩৬৭ খৃষ্টাব্দে কামরূপে আসিয়া একটি টাকশাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তখন মুসলমানেরা আসামের নাম দিয়াছিলেন চাউলের দেশ। সিকন্দরের পুত্র গিয়াস্‌-উদ্‌-দীন আজম্ শাহ্ গৌহাটিতে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। গৌহাটিতে আবিষ্কৃত একখানি আরবী শিলালিপি হইতে এই কথা জানিতে পারা গিয়াছে। শিলালিপিখানি এখন গৌহাটিতে কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় আছে। গৌহাটিতে মুঘলদিগের সহিত আসামের আহোমবংশীয় রাজাদের অনেকবার যুদ্ধ হইয়াছিল। আহোম রাজগণের বীরত্ব কাহিনী আজও আসামের ঘরে ঘরে পরিকীর্ত্তিত। বাংলার শাসনকর্ত্তা ইতিহাস প্রসিদ্ধ নবাব মীরজুম্‌লা আসাম আক্রমণ করিতে যাইয়া ঘরগাঁও পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু বন্যা ও বৃষ্টির জন্য এবং খাদ্যদ্রব্যাদির অভাবে তাঁহাকে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। ১২০৫ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ খিল্‌জিরও (বক্তিয়ার খিল্‌জির পুত্র) এইরূপভাবে আসাম অভিযান ব্যর্থ হইয়াছিল। জয়ধ্বজ সিংহ, চক্রধ্বর সিংহ এবং গদাধর সিংহ মুঘলদের নিকট হইতে কুড়িটি কামান কাড়িয়া লইয়াছিলেন। এই সকল কামানে পুরাতন অসমীয়া অক্ষরে রাজার নাম ও তারিখ এবং কামানটি যে মুসলমানদের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল এই সকল কথা সংস্কৃত ভাষায় লেখা আছে। খৃষ্টাব্দের অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে আহমরাজা গৌরীনাথ সিংহ বৈষ্ণব প্রজাদের বিদ্রোহের জন্য পুরাতন রাজধানী গড়্‌গাঁও ছাড়িয়া গৌহাটিতে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। অবশেষে ইংরাজদের সাহায্যে ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে গৌরীনাথ গৌহাটি ফিরাইয়া পান। বদনচন্দ্র বড়ফুকন্ নামক একজন রাজকর্ম্মচারীর সহায়তায় ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ হইতে আগত সৈন্য আসাম অধিকার করে। ইংরাজদের সহিত ব্রহ্ম দেশের রাজার যুদ্ধ বাধিলে ইংরাজ সৈন্য ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৮এ মার্চ্চ তারিখে গৌহাটি দখল করে এবং সেই সময় হইতে ইহা ইংরাজদের অধিকারে আছে।

গৌহাটির তিনদিকে অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড় আছে এবং ইহার উপরে আহোম্-রাজাদের নির্ম্মিত অনেকগুলি পুরাতন দেবমন্দির এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

গৌহাটির খেয়া ঘাটের নিকটে শুক্লেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের নিম্নে পাষাণ গাত্রে খোদিত বিষ্ণু, দুর্গা, গণেশ, সূর্য্য প্রভৃতির সুন্দর মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। গৌহাটি শহরের পূর্ব্ব প্রান্তে একটি অনুচ্চ পাহাড়ের উপর নবগ্রহ মন্দিরে সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি নয়টি গ্রহের পূজার ব্যবস্থা আছে।

গৌহাটিতে বহু দ্রষ্টব্য বস্তু আছে। উহাদের মধ্যে কটনকলেজ নামক প্রথম শ্রেণীর কলেজ, কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালা, গ্রাম্যশিল্পের সরকারী সংগ্রহ ও বিক্রয় কেন্দ্র, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৌহাটি-শাখা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

গৌহাটি শহর হইতে ৯ মাইল দূরে বনমধ্যে অবস্থিত বশিষ্ঠাশ্রম এখানকার একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। কথিত আছে, নিমিরাজার শাপে দেহহীন বশিষ্ঠমুনি এখানকার অমৃতকুণ্ডে স্নান করিয়া পূর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হন। এখানে ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষের শ্রেণী স্থানটিকে এক অপূর্ব্ব ও গম্ভীর সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে। একটি ঝরণা এখানকার প্রাচীন মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া কুলু কুলু রবে প্রবাহিতা। বশিষ্টের পত্নী অরুন্ধতীর স্মৃতি বিজড়িত অরুন্ধতীশিলা আয়ুষ্মতীগণের পরম প্রিয়। স্বামী-সৌভাগ্য লাভের আশায় তাঁহারা এই শিলাপট্টকে সিন্দুরের দ্বারা রঞ্জিত করিয়া থাকেন। গৌহাটি হইতে ঘোড়ার গাড়ী অথবা মোটর গাড়ীতে করিয়া বশিষ্ঠাশ্রমে যাওয়া যায়।

শিলং—পাণ্ডু হইতে আসামের রাজধানী শিলং ৬৭ মাইল দূর। পাণ্ডুঘাট হইতে সকাল বেলায় মোটর গাড়ী ও বাস ছাড়িয়া বেলা ১১টার মধ্যে শিলংএ পৌঁছায়। ফিরিবার সময় শিলং হইতে সমস্ত মোটর দুইটার পরেই ছাড়ে এবং রাত্রি আটটার পূর্ব্বেই গৌহাটি হইয়া পাণ্ডু আসিয়া পৌঁছায়। গৌহাটি হইতে নয় মাইল সমতল ক্ষেত্র দিয়া চলিবার পর জোড়াবাটের নিকট হইতে মোটর গাড়ী পাহাড়ের রাস্তা ধরে এবং আঁকাবাঁকাভাবে সর্পিল গতিতে পাহাড়ের গা বাহিয়া ওঠা-নামা করিতে থাকে। এই পথের দৃশ্য বড় সুন্দর। রাস্তার একদিকে খাড়া পাহাড় ও অপর পার্শ্বে গভীর খাদ; অরণ্য সমাবৃত পর্ব্বত-শিখরগুলি ঢেউএর মত একটির পর একটি চলিয়া গিয়াছে। এই পথে গৌহাটি হইতে ৩০ মাইল দূরে এবং সমুদ্র হইতে ১৭৮৬ ফুট উচ্চে অবস্থিত নংপো একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। এখানে উজান ও ভাটি দুই দিককার গাড়ী একত্র হয়। এখানে রাস্তার পার্শ্বে খাসিয়া রমণীগণ পান, সুপারি, কলা, চা প্রভৃতি বিক্রয় করে। এখানে কয়েকখানি দোকানও আছে। নংপোর নিকটে একটি রন্ধ্রপথ বা এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে যাইবার রাস্তা আছে। এই পথ দিয়া বন্যহস্তিগণ দলে দলে এক বন হইতে অন্য বনে যায়। নংপোর পর হইতে রাস্তার দুইদিকে শালের জঙ্গল দৃষ্ট হয়। এই রাস্তার পার্শ্ব দিয়া একটি পার্ব্বত্য নদী প্রবাহিত আছে। এই পথে ৫২ মাইল অতিক্রম করিবার পর দুইটি উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গের মধ্যে অবস্থিত শিলং শহরের দৃশ্য চোখে পড়ে। শিলং সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৫০০০ ফুট্ উচ্চ।

শিমলা, মুসৌরি বা দার্জিলিং যেমন পর্ব্বতের স্কন্ধে অবস্থিত, শিলং সেরূপ নহে। এই শহরটি পর্ব্বতের অধিত্যকা বা মালভূমির উপর অবস্থিত। ভারতবর্ষে যতগুলি শৈলনিবাস আছে, তাহাদের মধ্যে মাদ্রাজের উটাকামণ্ড, রাজপুতানার আবু এবং কাশ্মীরের সোনামার্গের মত শিলংও অধিত্যকার উপর নির্ম্মিত। এখানে সারা বৎসর স্বচ্ছন্দে বাস করা যায়, এখানে বৃষ্টিপাত কিছু অধিক বলিয়া গ্রীষ্মকালেও বিশেষ গরম হয় না। মেঘ ও কুয়াসা না থাকিলে শিলং হইতে ৪৫ মাইল দূরবর্ত্তী ব্রহ্মপুত্র নদ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। পাইনতরু বেষ্টিত শিলং নগরীর দৃশ্য অতি মনোরম। এখানকার রাস্তাগুলিও অতি সুন্দর। শিলং শহরের বহু দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে লাট সাহেবের বাড়ী ও তাহার নিকটবর্ত্তী অশ্বখুরাকৃতি ওয়ার্ড লেক নামক কৃত্রিম হ্রদ, কাউন্সিল ভবন, সেন্ট্ এডমাণ্ড কলেজ, রামকৃষ্ণ মিশন, পাস্তুর ইনস্টিটুট ও বড় বাজারের নাম উল্লেখ যোগ্য। শিলংএ বহু হোটেল ও বোর্ডিং হাউস আছে। শিলংএর গল্‌ফ্ খেলার মাঠ ও ঘোড় দৌড়ের মাঠও খুব

বিখ্যাত। গল্‌ফ্ খেলার মাঠটি সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থানীয়। শিলং শহরের অতি নিকটে অবস্থিত বিশপ্ ফল্ ও বিডন ফল্ নামক দুইটি জল প্রপাত ভ্রমণকারী মাত্রেরই দ্রষ্টব্য।

শিলং অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানকার কুহেলিকা (mist) ও পাইন তরুর হাওয়া শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী বলিয়া চিকিৎসকগণের অভিমত। ইহা বাঙালীদের অতি প্রিয় পার্ব্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস।

শিলংএ অতি উৎকৃষ্ট মাখন ও নানাপ্রকার সুস্বাদু ফলমূল সুলভে কিনিতে পাওয়া যায়।

চেরাপুঞ্জি—শিলং হইতে চেরাপুঞ্জির দূরত্ব প্রায় ৩৭ মাইল। এই দুই স্থানের মধ্যে প্রত্যহ মোটরবাস যাতায়াত করে। এই পথের দৃশ্যও অতি মনোরম। এই পথে ছয় মাইল দূরে আপার শিলং অবস্থিত। এখানে একটি সরকারী কৃষিক্ষেত্র আছে। আপার শিলংএ এলিফ্যান্ট বা হস্তী প্রপাত ও গেইট্ ফল্ নামক দুইটি জলপ্রপাত আছে। হস্তী প্রপাতটি রাস্তার অতি নিকটে অবস্থিত। এই প্রপাতটি তিনটি বিভিন্নস্তরে পাহাড়ের গা বাহিয়া নামিয়া আসিয়াছে; দেখিতে হস্তিশুণ্ডের ন্যায় বলিয়া ইহার "হস্তী প্রপাত" নাম হইয়াছে। ১৪ মাইলের পর রাস্তাটি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া একটি পথ শ্রীহট্টের দিকে চলিয়া গিয়াছে। ইহার পর হইতে পথের দুই পার্শ্বে গভীর অরণ্য দৃষ্ট হয়। এই পথে বহু বাঁক আছে। এক এক স্থানের বাঁক ইংরেজী U, V প্রভৃতি অক্ষরের আকৃতির ন্যায়। গাড়ীতে বসিয়াই পথের পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে ঘুটিং হইতে চূণ প্রস্তুত করিবার চুল্লী দেখিতে পাওয়া যায়। এই পথ দিয়া চলিতে চলিতে বহু খাসিয়া নরনারীর সহিত দেখা হয়। কেহ একা লইয়া চলিয়াছে, কাহারও পৃষ্ঠে বোঝা, আবার কেহ কেহ বা পথের পার্শ্বস্থ অরণ্য হইতে কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিতেছে।

চেরাপুঞ্জি শহরটিও শিলংএর ন্যায় অধিত্যকার উপর নির্ম্মিত। পূর্ব্বে ইহা খাসিয়া-জয়ন্তীয়া পাহাড় নামক জেলার সদর শহর ছিল। কিন্তু অত্যন্ত বৃষ্টিপাতের জন্য স্থানটি অস্বাস্থ্যকর বলিয়া ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে এই স্থান হইতে জেলার দপ্তর শিলংএ স্থানান্তরিত করা হয়। পৃথিবীর মধ্যে চেরাপুঞ্জিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হয়। এখানকার বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়ে ৪২৬ ইঞ্চি। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এখানে ৯০৩ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। যে পাহাড়ের মালভূমিতে চেরাপুঞ্জি শহর অবস্থিত তাহার নাম চেরা পাহাড়। ইহার উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৪,০০০ হাজার ফুট। ইহার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে অন্যান্য পর্ব্বতের মত ইহা ক্রমশঃ নিম্ন না হইয়া একেবারে শহরের প্রান্তে খাড়া ভাবে গিয়া শেষ হইয়াছে। এই স্থানে মুশমাই নামে একটি বৃহৎ জলপ্রপাত আছে। বর্ষাকালে ইহার বিস্তৃতি প্রায় ১৩০০ ফুট হয়। ইহার জলরাশি প্রায় ১৮০০ ফুট নিম্নে গিয়া পড়িতেছে। উচ্চতার দিক দিয়া এই জলপ্রপাত পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। চেরা পাহাড় যেখানে শেষ হইয়াছে তাহার পর শত মাইলেরও অধিক বিস্তৃত শ্রীহট্টের সমতল ক্ষেত্র দেখা যায়। মুশমাই প্রপাতের নিকট হইতে এই সমতল ক্ষেত্রের দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব। চেরাপুঞ্জির নিকটে একটি পর্ব্বত-গুহা আছে। ইহার প্রস্তরময় ছাদ ও প্রাচীরে সব সময়েই বিন্দু বিন্দু জল সঞ্চিত থাকে। তাহার উপর আলোক পড়িলে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের শোভার ন্যায় সুন্দর দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। চেরাপুঞ্জি হইতে ছাতক পর্য্যন্ত একটি রোপ্-ওয়ে আছে। ইহাও চেরাপুঞ্জির অপর একটি দ্রষ্টব্য।

শিলং হইতে আহারাদি করিয়া বেলা ১১টার সময় রওনা হইলে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই চেরাপুঞ্জি দেখিয়া ফিরিয়া আসা যায়।

(জ) নারায়ণগঞ্জ—ঢাকা—বাহাদুরাবাদ।

কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ হইয়া নারায়ণগঞ্জের দূরত্ব ২৫৯ মাইল। গোয়ালন্দ ও নারায়ণগঞ্জের মধ্যে প্রত্যহ ডাকবাহী স্টীমার যাতায়াত করে। এই জলপথের দূরত্ব ১০৪ মাইল। গোয়ালন্দ ও নারায়ণগঞ্জের মধ্যবর্ত্তী স্টীমার স্টেশনগুলির মধ্যে টেপাখোলা, কুতুবপুর-পদ্মা, ভাগ্যকুল, তারপাশা, বহর, মুন্সীগঞ্জ ঘাট ও মিরকাদিম ব্যবসায় প্রধান ও উল্লেখ যোগ্য স্টেশন।

ভাগ্যকুলের রায় উপাধিধারী বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও জমিদারবংশ বাংলার অন্যতম ধনী পরিবার বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভাগ্যকুল হইতে প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তী রাঢ়ীখাল গ্রাম বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পরলোকগত আচার্য্য সার জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের জন্মস্থান। ভাগ্যকুল হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী ঘোলঘর গ্রাম কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম বাঙালী প্রধান বিচারপতি স্বর্গীয় স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের জন্মস্থান।

তারপাশা একটি বিখ্যাত স্টীমার স্টেশন। এই স্থান হইতে স্টীমারযোগে মাদারিপুর ও খুলনা প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যায়। তারপাশা স্টেশনের অতি নিকটে ঢাকা জেলার অন্যতম বন্দর লৌহজঙ্গ অবস্থিত। লৌহজঙ্গের পাল চৌধুরী বংশও বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও ধনী। পূর্ব্বে লৌহজঙ্গে এই বংশের প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন ও একুশরত্ন মঠ বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু ছিল। কিন্তু কীর্ত্তিনাশা পদ্মার ভাঙ্গনে উহা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। লৌহজঙ্গের নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণগাঁ নামক পল্লী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর পিতা স্বর্গীয় ডক্টর অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মস্থান। পদ্মার ভাঙ্গনে এই পল্লীটিও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে।

বহর স্টেশনটি সাধারণের নিকট রাজাবাড়ী নামে পরিচিত। রাজাবাড়ীতে বিক্রমপুরের সুবিখ্যাত ভৌমিক ইতিহাস প্রসিদ্ধ কেদার রায়ের মাতার শ্মশানের উপর নির্ম্মিত একটি অতি সুন্দর ও সু-উচ্চ মঠ ছিল। পদ্মানদীর বহু দূর হইতে এই মঠের চূড়া দেখিতে পাওয়া যাইত। এরূপ সুন্দর মঠ বাংলা দেশে অতি অল্পই ছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই মঠটি গর্ভসাৎ করিয়া পদ্মা তাহার কীর্ত্তিনাশা নাম সম্পূর্ণরূপেই সার্থক করিয়াছে। বহরের নিকটবর্ত্তী দীঘির পাড় ঢাকা জেলার অন্যতম বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। বহর বা রাজাবাড়ীর বিপরীত দিকে পদ্মার অপর পারে বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার এলাকায় ইংরেজ ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির ঢাকাস্থ নায়েব দেওয়ান মহারাজা রাজবল্লভের বাসস্থান রাজনগর অবস্থিত ছিল। রাজবল্লভের প্রতিষ্ঠিত একুশ চূড়া বিশিষ্ট মঠ ও অন্যান্য কীর্ত্তিও পদ্মার কুক্ষিগত হইয়াছে। বহর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে বাঘিয়া গ্রামে লস্কর দীঘি নামক একটি পুরাতন দীঘি ও তত্তীরে অতি সুন্দর কারুকার্য্য খচিত একটি শিবমন্দির আছে। রূপরাম লস্কর নামক জনৈক ব্যক্তি এই দীঘি ও শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

বহরের অদূরবর্ত্তী তেলিরবাগ গ্রাম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পৈতৃক বাসস্থান।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে চাঁদরায় ও তাঁহার পুত্র বা ভ্রাতা কেদার রায় বিক্রমপুরে পদ্মার কূলে শ্রীপুর নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া সবিক্রমে রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহারা যথেষ্ট নৌবল সঞ্চয় করিয়া সন্দীপ প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করেন। শ্রীপুর তখন একটি প্রসিদ্ধ পোতাশ্রয় ছিল এবং পর্ত্তুগীজগণও জাহাজ মেরামতের জন্য এই স্থানে আসিতেন। সন্দীপ

পরে চাঁদরায়ের হস্তচ্যুত হয় এবং কিছু কাল পর্ত্তুগীজগণের অধীনে আসিয়া আরাকান রাজের হস্তগত হয়; তখন পর্ত্তুগীজ নেতা কার্ভালো প্রভৃতি পলাইয়া আসিয়া শ্রীপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে চাঁদ রায়ের মৃত্যুর পর মহারাজ মানসিংহ মন্দা রায় নামক একজন সেনাপতিকে শ্রীপুর অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করিলে নৌযুদ্ধে কেদার রায় ও কার্ভালো তাঁহাকে পরাস্ত ও নিহত করেন। তখন মহারাজ মানসিংহ স্বয়ং কেদার রায়কে দমন করিতে আসেন। কেদার পরাজিত হইয়া সপরিবারে সমুদ্রাভিমুখে পলায়ন করেন। অতঃপর তাঁহাদের মধ্যে সন্ধি হয়, কিন্তু কেদার সন্ধিমত কর না দেওয়ায় মহারাজ মানসিংহের আদেশে সেনাপতি কিলমক্ বিপুল বাহিনী লইয়া শ্রীপুর আক্রমণ করেন; কিন্তু তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। কেদার সহজ শত্রু নহেন বুঝিতে পারিয়া মানসিংহ স্বয়ং চতুরঙ্গবাহিনী সজ্জিত করিয়া শ্রীপুরের নিকটে আসিয়া হানা দিলেন: কথিত আছে, যে মানসিংহ একজন দূতের নিকট একখানি তরবারী ও একটি শৃঙ্খল সহ নিম্নলিখিত মিশ্রভাষায় রচিত শ্লোকটি লিখিয়া পাঠান,

"ত্রিপুর মঘ বাঙ্গালী কাককুলী চাকালী
সকল পুরুষ মেতৎ ভাগি যাও পলায়ী
হয়-গজ নর-নৌকা কম্পিতা বঙ্গভূমি
বিষম সমর সিংহো মানসিংহ প্রযাতি॥"

মহাবীর কেদার এই সিংহের হুঙ্কারে ভীত না হইয়া দূতের নিকট হইতে তরবারি গ্রহণ করিলেন এবং তাহার হাত দিয়া মানসিংহকে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটি লিখিয়া পাঠাইলেন,

"ভিনত্তি নিত্যং করিরাজকুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাদতীব
করোতি বাসং গিরি গহ্বরেষু
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ।"

অতঃপর উভয় পক্ষের প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। নয় দিন বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিবার পর মহাবীর কেদার রায় দশম দিবসে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন।

মানসিংহ কেদার রায়ের গৃহদেবতা শিলাময়ী দেবী ও পুরোহিত কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যকে জয়পুরে লইয়া যান। বিগ্রহটি এখনও সল্লা দেবী নামে তথায় পূজিত হইতেছেন। পুরোহিত কমলাকান্তের বংশ জয়পুরে বিদ্যমান। এই বংশের বিদ্যাধর নানা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং অম্বর রাজ জয় সিংহের প্রধান মন্ত্রী পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন; সুপ্রসিদ্ধ জয়পুর শহর তাঁহারই পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ম্মিত। শ্রীপুর ও চাঁদরায় কেদার রায়ের কীর্ত্তি সমূহ আজ পদ্মাগর্ভে বিলীন হইলেও এককালে যে উহা একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল তাহা পর্য্যটক র‍্যাল্‌ফ ফিচের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে জানা যায়। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বাক্‌লা হইতে শ্রীপুরে আসিয়া ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী সোনার গাঁও গমন করেন এবং পুনরায় শ্রীপুরে ফিরিয়া তথা হইতে জাহাজ যোগে পেগু গমন করেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে বাংলার প্রথম পাদরী ফ্রান্‌সিস্ ফার্নানদেজ শ্রীপুরে আগমন করেন এবং তথায় খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিবার অনুমতি পান।

ঢাকা জেলায় রাজাবাড়ী, টঙ্গীবাড়ী, লৌহজঙ্গ, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি থানা পল্লী অঞ্চলে ঘন লোক বসতি হিসাবে, বাংলা দেশের অন্য কয়েকটি থানার সহিত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচচ স্থান অধিকার করে।

নারায়ণগঞ্জ—কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত রেলপথে এবং তথা হইতে স্টীমারে সব শুদ্ধ প্রায় ২৫৯ মাইল দূর। লাক্ষ্যা, শীতলাক্ষ্যা বা শীতল লক্ষ্মী নদীর উপর অবস্থিত এই প্রসিদ্ধ বন্দর হইতে পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলপথের মাঝারি-মাপের একটি লাইন ঢাকা, টঙ্গী জংশন, ময়মনসিংহ জংশন, সিংহজানি জংশন প্রভৃতি হইয়া ১৪২ মাইল দূরবর্ত্তী বাহাদুরাবাদ পর্য্যন্ত গিয়াছে। পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলপথের ইহা একটি বিচ্ছিন্ন অংশ। নারায়ণগঞ্জ হইতে স্টীমার পথে একদিকে মুন্সীগঞ্জ, তারপাশা, ভাগ্যকূল, টেপাখোলা প্রভৃতি হইয়া গোয়ালন্দ ও অপর দিকে চাঁদপুর ও মেঘনা পথে ভৈরব, সুনামগঞ্জ, ছাতক প্রভৃতি হইয়া শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

শীতলক্ষ্যা নারায়ণগঞ্জের ৩ মাইল দক্ষিণে ধলেশ্বরী নদীর সহিত মিশিয়াছে এবং পূর্ব্বদিকে অল্প কিছুদূর গিয়া পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই মোহানা কলাগাছিয়া নামে খ্যাত। কয়েক মাইল দক্ষিণে গিয়া এই মিলিত জলধারা পদ্মায় গিয়া পড়িয়াছে। ইহার পর হইতে পদ্মা মেঘনা নামেই পরিচিত। শীতলক্ষ্যা সাতখামাইর স্টেশনের ১০ মাইল পূর্ব্বদিকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র হইতে নির্গত হইয়াছে; উপরের দিকে ইহা বানার নামে পরিচিত; এককালে শীতলক্ষ্যা পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের প্রধান খাত ছিল। ধলেশ্বরী ময়মনসিংহ জেলার সেলিমাবাদের উত্তরে নূতন ব্রহ্মপুত্র বা যমুনা হইতে উঠিয়া এলাশিন, কেদারপুর, সাভারের পাশ দিয়া বহিয়া আসিয়াছে; ধলেশ্বরী যমুনা হইতে অনেক পুরাতন নদী এবং ইহার খাত দিয়া এক কালে ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত হইত। মেঘনা মণিপুর রাজ্যের উত্তর সীমাস্থ পর্ব্বতশ্রেণী হইতে বাহির হইয়া প্রথমে সুরমা ও পরে মেঘনা নামে পরিচিত হইয়াছে; নীচের দিকে ইহা ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলার সীমা রক্ষা করিয়াছে। নারায়ণগঞ্জের ৪ মাইল পশ্চিমে বুড়ীগঙ্গা ধলেশ্বরীর পূর্ব্বকূলে আসিয়া মিশিয়াছে; বুড়ীগঙ্গা সাভার থানার ৪ মাইল দক্ষিণে ধলেশ্বরী হইতে বাহির হইয়া ঢাকা নগরীর পশ্চিমপ্রান্ত বাহিয়া আসিয়াছে; কালিকাপুরাণে বৃদ্ধগঙ্গা বা বুড়ীগঙ্গার উল্লেখ আছে; এককালে ইহা গঙ্গার কোনও খাত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বুড়ীগঙ্গা-ধলেশ্বরী সঙ্গমের ২ মাইল দক্ষিণে বিক্রমপুরের ইছামতী নদী ধলেশ্বরীর পশ্চিম কূলে আসিয়া মিশিয়াছে; পাবনা, যশোহর, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি স্থানেও ইছামতী নামে নদী দৃষ্ট হয়। (প্রধান লাইনের ঈশ্বরদি স্টেশন দ্রষ্টব্য)। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এক কালে ইছামতী পুণ্য সলিলা করতোয়ার শাখা ছিল; কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় যেমন এখনও করতোয়ায় লোকে তীর্থ স্নান করেন, সেইরূপ বিক্রমপুরে ইছামতীর পঞ্চতীর্থ ঘাটে আজও লোকে উক্ত তিথিতে স্নান করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করেন। এতগুলি নদীর সঙ্গম স্থলের নিকট অবস্থিত বলিয়া নারায়ণগঞ্জ একটি স্বাভাবিক বন্দর।

আন্দাজ ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান নারায়ণগঞ্জটি স্থাপিত হয়। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দেও এখানে একটি বড় লবণের গোলা ছিল এবং তথা হইতে প্রতি বৎসর পাঁচলক্ষ মণ লবণ আমদানি হইত। তৎকালে চীনা ও মগ বণিকেরা কারবারের জন্য এখানে আসিত। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে নারায়ণগঞ্জ স্বাধীন বন্দর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে নারায়ণগঞ্জ মহকুমা স্থাপিত হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে হইতে নারায়ণগঞ্জ চট্টগ্রাম বন্দরের অধীন বন্দর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। মুসলমান

যুগেও নারায়ণগঞ্জ একটি বন্দর ছিল; তখন ইহার কি নাম ছিল ঠিক্ জানা নাই। কথিত আছে, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারী ভিখনলাল ঠাকুর কোনও সন্ন্যাসীর নিকট হইতে পাঁচটি নারায়ণ চক্র পাইয়া একটি এই স্থানে, একটি পুরাতন ব্রহ্মপুত্র কূলে পঞ্চমী ঘাটে, একটি ইদ্রাকপুরে ও একটি ঢাকার লক্ষ্মী বাজারে ও আর একটি নরসিংহজীর আখড়ায় স্থাপিত করেন। এই বন্দরের আয় হইতে এই পাচটি নারায়ণ বিগ্রহের সেবার ব্যবস্থা করেন বলিয়া স্থানটির নাম নারায়ণগঞ্জ হইয়াছে।

নারায়ণগঞ্জ নগর এখন শীতলক্ষ্যার উভয় তীরে অনেক দূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এখানে বহু পাটের কল, ঢাকেশ্বরী ও লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি কাপড়ের কল, কাচের কল ইত্যাদি স্থাপিত আছে। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার পাট এখান হইতে রপ্তানি হয়। শীতলক্ষ্যার পশ্চিমকূলে রেল স্টেশন, হাজীগঞ্জ, ভগবান গঞ্জ, তান বাজার প্রভৃতি মহাল্লা এবং পূর্ব্বকূলে নবীগঞ্জ, সোনাকান্দা, মদনগঞ্জ প্রভৃতি শহরের অংশ অবস্থিত।

প্রসিদ্ধ বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে নারায়ণগঞ্জ কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"আমি প্রথমে যে নারায়ণগঞ্জ দেখিয়াছিলাম, সে নারায়ণগঞ্জ আজ আর নাই। সে নারায়ণগঞ্জ ছিল একটা গ্রাম ও বাজার। আজিকার নারায়ণগঞ্জ হইয়াছে একটা বড় বন্দর ও সহর। ঢাকা—নারায়ণগঞ্জে তখনও রেল হয় নাই। পাটের গুদাম দুই একটা হইয়াছে। বোধ হয় রালী ব্রাদার্সের আফিস বসিয়াছে। আর ছাতকের ইংলিস কোম্পানীর বড় একটা আফিস ছিল। নারায়ণগঞ্জে তখন হোটেল ছিল না। কতকগুলি আখড়া ছিল। এই সকল আখড়াতেই যাত্রীরা আশ্রয় ও আহার পাইত। এজন্য যথাসম্ভব প্রণামী দিতে হইত। এই প্রণামীর উপরে প্রসাদের গুণাগুণ নির্ভর করিত। সামান্য প্রণামী দিলে সাধারণ ডাল ভাত মিলিত; বেশী প্রণামী দিলে উৎকৃষ্ট আতপান্ন, গব্য ঘৃত, দৈ, সর, দুধ এবং মিষ্টান্ন মিলিত। আখড়ার নাট-মন্দিরে শুইবার স্থান মিলিত। গত পঞ্চাশ বৎসরে ইহার শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে।"

শহরের নবীগঞ্জ মহাল্লায় কদম রসুল বা হজরৎ মহম্মদের পদচিহ্নযুক্ত একখণ্ড প্রস্তর একটি সৌধ মধ্যে রক্ষিত আছে। বার ভুঁইয়ার অন্যতম প্রধান ভুঁইয়া সুপ্রসিদ্ধ ঈশা খাঁর প্রপৌত্র মানোয়ার খাঁ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইহা নির্ম্মাণ করেন এবং ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে গোলাম নবী নামক একজন মুঘল কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক ইহা পুনর্নির্ম্মিত হয়।

শহরের হাজীগঞ্জ ও সোনাকান্দা মহাল্লায় দুইটি পুরাতন গোলাকার জলদুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়; মুনসীগঞ্জের নিকটস্থ প্রসিদ্ধ কলাগাছিয়া সঙ্গমের উপর ইদ্রাকপুরে ঠিক্ অনুরূপ একটি জলদুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। ইহাদের মধ্যে সোনাকান্দার দুর্গটি দেখিলে পূর্ব্বাবস্থা বুঝিতে পারা যায়, বর্ষাকালে এখনও দুর্গটির চারিদিকে নৌকাযোগে ঘোরা যায়; গোল দেওয়ালে একহাত দুইহাত অন্তর কামান বসাইবার ছিদ্র এবং একটি মুর্চার উপর বড় কামান বসাইবার স্থান। সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বাংলার সুবাদার মীর জুমলা কর্ত্তৃক পর্ত্তুগীজ ও মগ দস্যুদের আক্রমণ হইতে রাজধানী ঢাকা নগরী দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিবার জন্য এই তিনটি দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই জাতীয় জলদুর্গ বোম্বাই প্রদেশের থানা জেলা ভিন্ন ভারতবর্ষের আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। হাজীগঞ্জের দুর্গটি পরিধিতে প্রায় দেড় মাইল এবং উহা এখন ঢাকার নবাবদের হাফেজ মঞ্জিল নামক বাগানের মধ্যে পড়িয়াছে। সম্ভবতঃ মীর জুমলার পূর্ব্বেও এখানে একটি দুর্গ ছিল। প্রবাদ বার ভুঁইয়ার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ চাঁদরায়ের কন্যা ও ঈশা খার পত্নী সোনা বিবি এই দুর্গে থাকিয়া মগ দিগের সহিত সবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং নিশ্চিত পরাজয় বুঝিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন।

চেরাপুঞ্জির পথে (পৃষ্ঠা ৪০)

চেরাপুঞ্জি বাজার (পৃষ্ঠা ৪০)
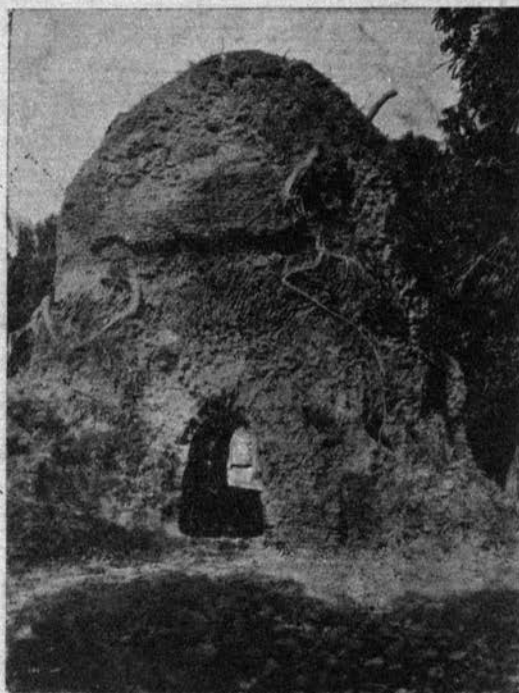
হাজীবাবার দরগাহ্, নারায়ণগঞ্জ (পৃষ্ঠা ৪৪)

লালবাগ কেল্লা, ঢাকা (পৃষ্ঠা ৫৬)

নারায়ণগঞ্জের এক মাইল উত্তরে হাজীগঞ্জ মহাল্লার পার্শ্বেই খিজিরপুর গ্রাম। বার-ভুঁইয়ার অন্যতম প্রধান ভুঁইয়া ঈশা খাঁ মশ্নদ-ই-আলির রাজধানী এই স্থানে ছিল। কথিত আছে, ঈশা খাঁ রাজপুত বংশীয় হিন্দু ছিলেন এবং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সুলতান সুলেমান কররাণীর পুত্র বায়াজিদের সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করেন এবং শীঘ্রই প্রতিভাবলে আড়াই-হাজারী সেনানায়ক হন। সুলতান দায়ুদের সময়ে তিনি রাজমহলের যুদ্ধে বিশেষ সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। দায়ুদের মৃত্যুর পর তাঁহার বহু সৈনিক ঈশা খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে। অতঃপর তিনি পূর্ব্ববঙ্গের সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁওয়ের অন্তর্গত খিজিরপুরে আসিয়া রাজত্ব স্থাপন করেন। শ্রীপুরের সুপ্রসিদ্ধ ভুঁইয়া চাঁদরায় ও কেদার রায়ের সহিত প্রথমে তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা সোনামণিকে বিবাহ করায় সেই আঘাতে চাঁদ রায় শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং কেদার রায় প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আজীবন বিদ্বেষবহ্নি জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে ঈশা খাঁ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করায় দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক শাহবাজ খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। শাহবাজ খাঁ বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। অতঃপর মহারাজ মানসিংহ তাঁহাকে দমন করিতে আগমন করেন। ঈশা খাঁ খিজিরপুর হইতে হটিয়া সাতখামাইরের ১০ মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত এগার-সিন্ধু দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কথিত আছে ঈশা খাঁ মানসিংহকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করেন এবং তাঁহার বীরত্বে ও সাহসিকতায় প্রীত হইয়া মানসিংহ তাঁহার সহিত সন্ধি করেন ও বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হন। ঈশা খাঁ তখন মানসিংহের সহিত আগ্রায় গিয়া বাদশাহের নিকট হইতে ২২ পরগণার জমিদারী ও মস্নদ-ই-আলি উপাধি প্রাপ্ত হন। খিজিরপুরে একটি উদ্যান মধ্যে শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের একটি সমাধি সম্রাট জাহাঙ্গীরের এক কন্যার বলিয়া প্রবাদ। ইহা কাহার সমাধি তাহা ঠিক জানা নাই। খিজিরপুর হইতে ৬ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে দেওয়ানবাগ নামক স্থানেও ঈশা খাঁর একটি দুর্গ ছিল; তাঁহার প্রপৌত্র মানোয়ার খাঁর এই স্থানে বাস ছিল। দেওয়ানবাগে একটি মৃত্তিকা স্তূপ হইতে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর সাতটি কামান আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ গুলি ঢাকার চিত্রশালায় রক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি কামান সম্রাট শের শাহের; তৎকর্ত্তৃক আনীত কনস্তানতিনোপ্‌ল্‌ নিবাসী সৈয়দ আহমদ নামক বিখ্যাত কারিগর কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত।

পানাম—নারায়ণগঞ্জ হইতে প্রায় ৮ মাইল পূর্ব্বদিকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মধ্যস্থলে পানাম গ্রামটি আজ জঙ্গলাকীর্ণ হইলেও পূর্ব্বকালে প্রসিদ্ধ সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁও নগরী এই স্থানে অবস্থিত ছিল; গড় ও প্রাকারের ভগ্নাবশেষ এখনও এই স্থানে দৃষ্ট হয়। প্রবাদ মহারাজ জয়ধ্বজের সময়ে এই অঞ্চলে সুবর্ণ বৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া এই স্থান সুবর্ণগ্রাম নামে পরিচিত হয়। ইহা একটি বিস্তৃত ভূখণ্ড ছিল; ইহার উত্তরে ছিল পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, পূর্ব্বে আড়িয়লখা (বাখরগঞ্জ জেলায় এই নামে বড় নদী আছে) ও মেঘনা এবং দক্ষিণে ও পশ্চিমে শীতলক্ষ্যা। মহম্মদ বিন্ বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী কর্ত্তৃক গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী অধিকৃত হইলে সেনবংশীয় রাজগণ প্রায় ১২০ বৎসর পর্য্যন্ত বিক্রমপুরের রামপাল ও সুবর্ণগ্রামে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পশ্চিম হইতে নবাগত মুসলমানগণের ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব হইতে আরাকানের মগগণের বার বার আক্রমণে সেনরাজগণ ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়েন এবং খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পূর্ব্ব-বঙ্গ মুসলমান অধিকারে আসে। মধুসেন ও দনুজ মাধব বা দনুজরায় ব্যতীত সুবর্ণগ্রাম তথা পূর্ব্ব-বঙ্গের অপর স্বাধীন হিন্দু রাজার ঐতিহাসিক প্রমাণ বিশেষ নাই। মুসলমান যুগে রামপালের অবনতি ও সোনারগাঁওএর বিশেষ-উন্নতি হয়। ১২৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা পূর্ব্ব-বঙ্গের মুসলমান শাসকবর্গের রাজধানী ছিল এবং এই স্থানে টাকশাল প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে আহোম, মগ ও পর্ত্তুগীজদের উৎপাত নিবারণার্থ

বাংলার রাজধানী রাজমহল হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। তখন হইতে পূর্ব্ব-বঙ্গের শাসন কেন্দ্রও ঢাকায় অবস্থিত হয়। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ইবন বতুতা সোনারগাঁও আগমন করেন এবং তথা হইতে যবদ্বীপগামী একটি বাণিজ্য-পোত দেখিয়াছিলেন। ফক্‌রুদ্দীন এই সময়ে সোনারগাঁওএর সুলতান ছিলেন। ইবন বতুতা রাজপ্রাসাদ বিশেষ সুদৃঢ়ভাবে রক্ষিত দেখিয়াছিলেন; আজিও পরিখার উপরের একটি পুরাতন পুলের সম্মুখে তোরণদ্বারের ভগ্নচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ভ্রমণকারী র‍্যালফ ফিচ্ এই স্থানে আগমন করেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন সোনারগাঁওএর কাপাস-বস্ত্র ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার সময়ে সোনার গাঁওএর রাজা ছিলেন ঈশা খাঁ। পাঠান যুগে সোনারগাঁও হজরৎ-ই-জলাল নামে অভিহিত হইত। চীন্‌সম্রাট্ লুইতি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পলাতক হইলে তাঁহার শত্রুপক্ষ তাঁহার পশ্চাতে পশ্চিম মহাসাগরে যাত্রা করিয়া সোনা-উরকং ও পান-কো-লো নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন বলিয়া লিখিত আছে। সোনা-উরকং ও পান-কো-লো সোনারগাঁও ও বাংলা বলিয়া অনুমিত হয়।

পানামের নিকটেই সোনারগাঁওয়ের অন্তগত মগরাপাড়া গ্রামে মগ দীঘি নামক একটি জলাশয়ের তীরে গৌড়রাজ গিয়াস-উদ্দীন আজমশাহের সুন্দর কারুকার্য্য খচিত কষ্টিপাথরের সমাধি বিদ্যমান। সম্ভবতঃ পূর্ব্ব-বঙ্গের রাজধানী সোনারগাঁওএ অবস্থানকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। সমাধির সিকি মাইল পশ্চিমে বাঘালপুর গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে পাঁচপীরের দরগাহ নামে পাঁচটি দরগাহের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এগুলি গয়েস্‌দি, সমসদ্দি, সিকন্দর, গাজী ও কালু নামক পাঁচজন যোদ্ধৃ ফকিরের নমাজের স্থান ও সমাধি বলিয়া কথিত। এ অঞ্চলে মাঝি মাল্লারা নদী পারাপারের সময়ে পীর বদরের সহিত পাঁচ পীরের নাম লইয়া থাকে। মগরাপাড়ায় পীর শাহ্ আব্‌দুল আলা বা পোকাই দেওয়ানের সমাধি বিশেষ পবিত্র গণ্য হয়; প্রবাদ ইনি ১২ বছর জঙ্গলমধ্যে গভীর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন, আহারাদি করিতেন না এবং তাঁহার চারিদিকে প্রকাণ্ড উইঢিবি গড়িয়া উঠিয়াছিল। মগরাপাড়ার নিকটে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র কূলে পোড়ারাজা বা দ্বিতীয় বল্লাল সেন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি পাথরের রথের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহার গাত্রে নানারূপ কারুকার্য্য খোদিত আছে। প্রবাদ রথ-দ্বিতীয়ার দিন একশত ব্রাহ্মণ রথটিকে টানিয়া লইয়া যাইতেন; কিন্তু অন্য কোনও দিন বহুশত লোকে মিলিয়াও ইহাকে নড়াইতে পারিত না।

পানামের নিকটে গোয়ালদী গ্রামে গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের রাজত্বকালে ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে মোল্লা আকবর খাঁ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদ আছে। ইহা সোনারগাঁওএর প্রাচীনতম মসজিদ। ঘোর লাল রঙের ইট দিয়া মসজিদটি নির্ম্মিত এবং তিনটি গম্বুজের মধ্যকারটি নীল মর্ম্মর প্রস্তরের।

পানামের নিকটে আমিনপুর গ্রামে ক্রোড়ী বাড়ী বলিয়া একটি ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। ইহা মহারাজ বল্লাল সেনের সেনাপতি বংশীয় বলরাম দাস নামক মুসলমান রাজাদের জনৈক কোষাধ্যক্ষের বাটী বলিয়া পরিচিত।

পানামের নিকটস্থ ঝিনারদি গ্রাম পূর্ব্বে দীনার দ্বীপ নামে অভিহিত হইত বলিয়া কথিত। দীনার দ্বীপের ষষ্ঠীবর সেন ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন কৃত রামায়ণ, মহাভারত ও পদ্মপুরাণের প্রাচীন পুঁথি পূর্ব্ব-বঙ্গের নানা স্থানে পাওয়া যায়। ষষ্ঠীবরের গুণরাজ খাঁ উপাধি ছিল। ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—"ষষ্ঠীবরের রচনা সংক্ষিপ্ত সরল ও পরিপক্ব, কিন্তু তৎপুত্র গঙ্গাদাসের রচিত পদ্য চঞ্চল ও সুন্দর, তাহা বেশ চিত্তাকর্ষক; তত সংক্ষিপ্ত নহে কিন্তু বিস্তৃত হইয়াও মনোরম্য।"

সোনারগাঁয়ের অনেক স্থানে কোচ দিগের প্রতিষ্ঠিত দীঘি দেখিতে পাওয়া যায়।

সোনারগাঁয়ের "হরিদাস খানি" দই ও সরভাজা প্রসিদ্ধ।

লাঙ্গলবন্ধ—নারায়ণগঞ্জ হইতে ৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম কূলে অবস্থিত। চৈত্রমাসে অশোকাষ্টমীর সময়ে দূরদূরান্তর হইতে বহুলোক এই স্থানে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে আসেন। এই সময়ে দুই তিন দিন স্থায়ী চৈত্রবারুণী নামে একটি মেলা বসিয়া থাকে; মেলায় লোকশিল্পের নিদর্শন স্বরূপ কিছু কিছু দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। অশোকাষ্টমী তিথিতে জগতের সকল তীর্থ, নদী ও সাগর ব্রহ্মপুত্র নদে উপনীত হয় বলিয়া কথিত। অনেকে এই সময়ে এক মাস ধরিয়া লাঙ্গলবন্ধে তীর্থাবাস করেন; ইহা প্রয়াগে কল্প বাসের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

কথিত আছে পরশুরাম মাতৃহত্যা করিলে তাঁহার কুঠারটি হস্ত হইতে আর বিচ্ছিন্ন হয় না; তখন পিতার আদেশে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া মাতৃহত্যা জনিত পাপ হইতে মুক্ত হন ও কুঠারটি হস্ত হইতে স্খলিত হয়। তখন তিনি মানবের কল্যাণের জন্য কুঠারটিকে লাঙ্গলরূপে ব্যবহার করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের জলরাশি সমতল ক্ষেত্রে লইয়া আসেন; কিন্তু এই স্থানে পৌছিয়া তাঁহার কুঠার বা লাঙ্গল আটকাইয়া যায়। ব্রহ্মপুত্রকে শীতলক্ষ্যার সহিত মিলিতে নিষেধ করিয়া তীর্থরাজে পরিণত করিবার মানসে পরশুরাম তীর্থযাত্রা করেন। ইতিমধ্যে ব্রহ্মপুত্র পরশুরামের অজ্ঞাতে শীতলক্ষ্যার দর্শনে গমন করেন। খবর পাইয়া শীতলক্ষ্যা বৃদ্ধার বেশে পথিমধ্যে বসিয়া থাকেন। ব্রহ্মপুত্র তাঁহাকেই আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন শীতলক্ষ্যা আর কতদূরে। বৃদ্ধা তখন বলিলেন যে তিনিই শীতলক্ষ্যা, ব্রহ্মপুত্রের তাণ্ডবরবে ভীত হইয়া ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া ব্রহ্মপুত্র লজ্জা পাইয়া লাঙ্গলবন্ধে ফিরিয়া গেলেন। তীর্থ হইতে ফিরিয়া পরশুরাম সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া ব্রহ্মপুত্রের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। অবশেষে ব্রহ্মপুত্রের অনুনয় বিনয়ে শান্ত হইয়া তিনি বলেন যে বৎসরে মাত্র একদিন অশোকাষ্টমী তিথিতে ব্রহ্মপুত্র নদ তীর্থরাজ হইবে ও ইহার পশ্চিম কূলে স্নান করিলে সকল তীর্থ স্নানের ফললাভ হইবে। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ববতীরের স্থান পাণ্ডব-বর্জ্জিত বলিয়া কথিত।

লাঙ্গলবন্ধে জাগ্রত প্রাচীন জয়কালী দেবী ব্যতীত বহু দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্নান ঘাটের নিকট একটি বটতলা প্রেমতলা নামে খ্যাত; অশোকাষ্টমীর সময়ে বৈষ্ণবগণ এই স্থানে সমবেত হইয়া অহোরাত্র নামকীর্ত্তন করেন বলিয়া ইহার নাম প্রেমতলা। কথিত আছে পাণ্ডবগণ বনবাস কালে এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। লাঙ্গলবন্ধ হইতে ৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমকূলে পঞ্চমীঘাট নামক স্থানে তাঁহারা স্নান ও তর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত; তথায় এখনও যাত্রীরা স্নান ও তর্পণ করিয়া থাকেন। অশোকাষ্টমীতে এই স্থানেও লোকে স্নান করিয়া থাকেন।

বারদী—মেঘনাকূলে নারায়ণগঞ্জ মহকুমার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। নারায়ণগঞ্জ হইতে মেঘনা পথে ভৈরব হইয়া শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত যে স্টীমার যায় ঐপথে বারদী স্টীমার ঘাট মাত্র ৪ ঘণ্টার পথ। এইগ্রামে সুপ্রসিদ্ধ সাধক লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রম ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ অলৌকিক ঘটনার কথা শোনা যায়। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম-বঙ্গের কোনও গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। কথিত আছে তাঁহার পিতা বংশের উদ্ধার-সাধন মানসে বালক লোকনাথকে উপবীত দিয়া আচার্য্য গুরু ভগবান গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে সন্ন্যাস জীবনের জন্য সঁপিয়া দিয়া চিরতরে বিদায় দেন। তিনি বহুকাল হিমালয়ে তপস্যা করিয়াছিলেন এবং আরবদেশ, ইউরোপ খণ্ড প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ

করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। তাঁহার দৃষ্টি এত প্রখর ছিল যে লোকে তাহা সহ্য করিতে পারিত না। তিনি জাতিস্মর ছিলেন ও সাময়িকভাবে দেহ ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিয়া পুনরায় দেহে ফিরিয়া আসিতেন বলিয়া কথিত।

চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে বারদীতে ৭ দিন ধরিয়া মেলা হয়।

মুন্সীগঞ্জ—কলাগাছিয়া মোহানার দক্ষিণে নারায়ণগঞ্জ হইতে ৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। নারায়ণগঞ্জ হইতে গোয়ালন্দ ও ভৈরব-শ্রীহট্টগামী স্টীমার এখানে ধরে। ঢাকা জেলার ইহা অন্যতম মহকুমা। শহরের নিকটেই মীর জুমলার ইদ্রাক্‌পুর জলদুর্গের মধ্যে সদর-আলার বাসভবন অবস্থিত। মুন্সীগঞ্জের প্রায় অর্দ্ধ মাইল উত্তরে ধলেশ্বরী কলাগাছিয়া মোহানার দক্ষিণ কূলে সুপ্রসিদ্ধ ও সুবৃহৎ কার্ত্তিক বারুণীর মেলা বসিয়া থাকে। এ অঞ্চলে এত বড় মেলা আর কোথাও নাই। পূর্ব্বে এই মেলা কার্ত্তিক পূর্ণিমায় আরম্ভ হইত, এখন কিছু পরে আরম্ভ হইয়া ৩।৪ মাস স্থায়ী হয়; বহু দূরদেশ হইতে ব্যবসায়ীরা এখানে আসিয়া থাকে। মুন্সীগঞ্জে সম্প্রতি একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সুবিখ্যাত বিক্রমপুর পরগণা মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত। বহুবার এই পরগণার সীমানা পরিবর্ত্তন হওয়ার জন্য ইহার কিয়দংশ বর্ত্তমানে ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। উত্তরে ধলেশ্বরী নদী, দক্ষিণে ইদিলপুর পরগণা, পূর্ব্বে মেঘনা ও পশ্চিমে পদ্মা—সাধারণতঃ এই চতুঃসীমার অন্তর্গত ভূভাগ বিক্রমপুর নামে পরিচিত। বিক্রমপুরের বহু প্রাচীন কীর্ত্তি লোপ করায় এই অঞ্চলে পদ্মার নাম যে কীর্ত্তিনাশা হইয়াছে সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিক্রমপুর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ যে প্রাচীন কালে এই স্থানে বিক্রম নামক জনৈক রাজার রাজ্য ছিল।

মুন্সীগঞ্জ হইতে তিন মাইল পশ্চিমে বিক্রমপুরের প্রাচীন রাজধানী রামপাল অবস্থিত। প্রবাদ অনুসারে পালবংশীয় নৃপতি রামপালদেবের নাম হইতেই এই স্থানের "রামপাল" নাম হইয়াছে। বিক্রমপুর অঞ্চলে যে এক সময়ে পাল রাজগণের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, বিক্রমপুরের বিভিন্ন প্রাচীন স্থান হইতে প্রাপ্ত পালযুগের বহু শিল্পদ্রব্য, প্রস্তরমূর্ত্তি ও মুদ্রাস্কর্য্য হইতে তাহার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেনবংশীয় নৃপতি বল্লাল সেনের সীতাহাটি তাম্রফলকে "স খলু শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ" এইরূপ লিখিত আছে। ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকে অনুমান করেন যে এই শ্রীবিক্রমপুর ও বর্ত্তমান রামপাল অভিন্ন।

মুন্সীগঞ্জের দেড় মাইল উত্তর-পশ্চিমে ধলেশ্বরীর দক্ষিণ-কূলে সুপ্রসিদ্ধ গঞ্জ মীর কাদিম অবস্থিত। মীর কাদিম হইতে আরও দেড় মাইল পশ্চিমে ফিরিঙ্গী বাজার গ্রাম। নবাব শায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া ফিরিঙ্গী বন্দীদিগকে আনিয়া এই স্থানে বসতি স্থাপন করেন। এখানে একটি পুরাতন রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জাঘর আছে।

বিক্রমপুরের বহু গ্রামে বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবী মূর্ত্তি অনেক আবিষ্কৃত হইয়াছে। বহুকাল ধরিয়া সংস্কৃত চর্চা ও জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনার জন্য বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধি ছিল। বিক্রমপুরের পর নবদ্বীপে পঞ্জিকা প্রস্তুত আরম্ভ হয়। বিক্রমপুরের স্থানীয় সময় উজ্জয়িনী হইতে ইহার দেশান্তর দুই দণ্ড চৌত্রিশ পল ঠিক ভাবে গণনা করিয়া পঞ্জিকায় দেওয়া হইত। নবদ্বীপ ও কলিকাতায় পঞ্জিকা প্রস্তুত আরম্ভ হইলে তাহাতে বিক্রমপুরের স্থানীয় সময়ই